সময়েই আশপাশের শ্রোতার কাণগুলিকে অধীর করে' রাখে।

একহারা ডিগ্‌ডিগে গড়ন; রোগা রোগা দুখানি হাতে দু-গাছি সোণার পাত মোড়া ঢাকাই শাঁখা,—সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারের মধ্যে ও ছাড়া আর কিছু নেই; মাথার পাতলা কটাসে চুলগুলির মাঝামাঝি চওড়া মেটে সিঁদুর; পরণে একখানি ময়লা রুটো শাড়ী। যৌবনের কোনো গরিমাই সে দেহে নেই,—কোনো দিন যে ছিল তাও এক নজরে বিশ্বাস করা কঠিন।

ঝগড়া-ঝাঁটি অশান্তি শুধু ওই দুখানি ঘর, একটুখানি দালান, একফালি উঠোন আর সদর দরজার জমিটুকু নিয়েই।

তা সরোজিনী অন্যায় কিছু বলে না। বলে—দেবো না? অনিষ্ট কল্লে গাল দেবো না? আমি ত কারো বাড়ীর দরজায় মাছের কাঁটা ফেলতে যাইনি!

মা'র গলার আওয়াজ শুনে বিমলা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বয়স এখন তার পনেরো কি ষোল। রূপ যেন ছড়িয়ে পড়ছে।

বলে—চুপ কর মা, একটু আস্তে। ও বাড়ীর ওরা কি মনে করে বল দেখি?

তুই থাম্ দেখি লা আবাগি? চুপ করবো!—নর্দ্দমার জলের ছিটের আমার ধবধবে কাপড়খানা চুলোয় গেল, বলি ব্যাটার মাথা খেয়ে সর্ব্বনাশীরা কানা হয়ে বসেছে? দেখতে পায় না?

বিমলা বলে—কই, জলের ছিটে ত তোমার কাপড়ে লাগেনি!

লাগেনি! একশোবার লেগেছে! হাওয়া লেগে এতক্ষ শুকিয়ে গেছে—নৈলে নাকের ওপর ধরে আবাগিদের দেখি দিতাম!

তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি।—বলে' বিমলা সেখান থেকে সরে' যায়।

শুচিবায়ুগ্রস্ত নারীটির কয়েকটি জঘন্য আচার বাড়ীটিকে সর্ব্বদা একটি দুষ্ট আবহাওয়ায় ভরিয়ে রেখেছে। সমস্ত ঘরগুলির দেয়ালে প্রায় দুহাত উঁচু করে' গোবর লেপে দেওয়া,—সেখানে মাছি ভন্‌ভন্ করে, পোকায় বাসা বাঁধে, কাঁকড়া বিছা বেরোয়, আবার দুর্গন্ধেও টেঁকা যায় না! ধোপাকে কাপড় কাচ্‌তে দেওয়া হয় না, কারণ ছোট জাতের ঘর থেকে কাপড় ফিরে এলে তার নাকি জাত যায়। টাকা পয়সা সরোজিনীকে কোনো দিন ছুঁতে দেখা যায় নি,—ওগুলো নাকি অনেকের নোংরা হাত ঘুরে আসে। বাজারের তরীতরকারীগুলি প্রতিদিন গঙ্গার ঘাটে গিয়ে নিজে হাতে ধুয়ে আনা চাই; পথে কেউ হঠাৎ ছুঁয়ে ফেললেই—বাস্, সব ফেলে দিয়ে আসতে হবে! বাড়ীর ভিতরে আর বাইরে সমস্ত নোংরা স্থানগুলি সে নিজেই মুক্ত করে, কারণ রান্নাঘরের সংশ্লিষ্ট নর্দ্দমায় ঝাড়ুদারের হাত পড়লেই ত একেবারে ধর্ম্মনাশ!

অতি পরিচ্ছন্নতার বাহুল্যে ঘর-দোর দিবারাত্র কেমন যেন শ্রীহীন হয়ে থাকে। এখানে সেখানে শ্যাওলা পড়া; ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে থাকে; কেঁচোয় মাটী তোলে; আরশোলায় ডিম পাড়ে। জিনসপত্রগুলি জলে ধুয়ে ধুয়ে এক [illegible] ছ্যাৎলা পড়ে' আছে।

চেনা ও জানা

বিছানাগুলি কোনো দিন রোদে পড়ে না—কি জানি পাখ-পক্ষীতে যদি নষ্ট করে' দেয়! ঘরগুলির একটা ভ্যাপ্‌সা দুর্গন্ধে তার ত্রি-সীমানায় আসবার উপায় নেই। কোনো সহজ সুস্থ মানুষের পক্ষে এ বাড়ীতে বাস করা কঠিন।

বিমলার নীচে সরোজিনার সবশুদ্ধ তিনটি সন্তান নষ্ট হয়ে গেছে। এই কিছুদিন আগে যেটি মারা গেল সেটি সাত-আট বছরের একটি দুরন্ত ছেলে। ছুটে ছুটে বেড়াতো, হাঁক্-ডাক মানত না। দিনে অন্তত পাঁচবার সরোজিনী তাকে কলতলায় গিয়ে কেচে আন্‌তো।—ম্যালেরিয়া হল! জ্বর ছাড়ে আর সরোজিনী তাকে চান্ করায়—কারণ সে ডাক্তারের ওষুধ খেয়েছে। আবার রোগে পড়ে। এমনি করে সেই কঙ্কালসার ছেলেটির একদিন নিঃশব্দে শেষ হয়ে গেল।

স্বামীটি জীবন-বীমার আফিসে চাকরি করেন। অতিরিক্ত বৈষয়িক লোক। মাঝে মাঝে আসেন আবার টাকার গন্ধ পেয়েই চলে যান। দেশে দেশে ঘোরাই তাঁর কাজ।

আহারের সময় সরোজিনীকে দুনিয়ার লোকে দেখতে পায় না। কেন না, সে অতি লজ্জার কথা; সেই অবস্থাতেই এঁটো হাতে সে মাটীতে শুয়ে কয়েক ঘণ্টা কাটায়; দরজাটা ভেজানোই থাকে। সন্ধ্যার আহার শেষ করে' তবে সে ঘর থেকে বেরোয়।

বিমলা মাঝে মাঝে অত্যন্ত রেগে ওঠে। বলে—মরবে তুমি, এ তোমার রোগ; এই রোগেতেই তুমি মরবে তা বলে দিচ্ছি। তবু যদি না হাতে-পায়ে হাজা ধরে' পোকা পড়তো, তা হলেও

বুঝতাম! জল ঘাঁটা না ছাড়লে হাজার ওষুধ দিলেও তোমার হাত-পা ভাল হবে না। ওই পোকা পড়া হাতে খাও, পুজো কর—লজ্জা হয় না? বেঁচে থাকতেই তোমার নরক ভোগ হয়ে যাচ্ছে আর কি!

আ মর্!—বলে' একটু হেসে মুখে গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে সরোজিনী আহ্নিক করতে বসে।

এমনিই; এর কোনো মানে নেই। এই শুচিবায়ুগ্রস্ত মন তার আগেও ছিল না, ভবিষ্যতে থাকবে কি না কে জানে! মনে হয় জামাইয়ের মৃত্যুর সেই নিদারুণ শোকটা তার মনকে... করে' কতকগুলি অন্ধ কুসংস্কারের মধ্যে গলা টিপে মেরেছে।

কিন্তু সেই শোকটাকে আড়াল করে' দাঁড়াতে পারে এমন কিছুই নেই। সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রহীনা মাতার বুকখানি ক্রমশঃ উদ্বেল হয়ে ওঠে। সঙ্গীহীনা নিঃসম্বল কন্যাটির দিকে চেয়ে মায়ের চোখে জল গড়িয়ে আসে। মেয়ের সারা-জীবন কাটবে কেমন করে! প্রতিদিনের দীর্ঘ নিদ্রাহীন রাত্রিই বা কাটে কি নিয়ে!

আঃ বাবারে বাবা—বিমলা বলে—আমাকে শুদ্ধু পাগল কল্লে! অমন করে' হাই-হুতোশ কল্লে কোথায় যাই বল ত? সব মানুষই কি বুড়ো হয়ে মরে?

রাত্রে বিমলা যখন নিজের জীর্ণ শয্যাটির ওপর শুয়ে থাকে, সরোজিনী আলো হাতে ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে হেঁট হয়ে তার মুখের দিকে তাকায়। দেখে—মুখের ...থার কোন অদল-বদল

চেনা ও জানা

মাইরি ভাই, এই তোর গা ছুঁয়ে বল্‌ছি।—হেসে লুটোপুটি খেয়ে ভৈরবী দিদি বললেন—আজ তবে আসি ভাই।

যাচ্ছ? বাঁচলাম!

কথাটা শুনেই হঠাৎ ভৈরবী গম্ভীর হয়ে গেলেন। দরজার কাছে গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে বললেন—বিধবা হলি তবু হাড়-জ্বালানে কথাগুলো তোর গেল না বিম্‌লি!

কি ভাগ্যি যে সরোজিনী সেখানে ছিল না।

দেখতে দেখতে আবার বছর ঘুরে আসে। কর্তা বারকয়েক এসেছিলেন; আবার কাজ নিয়ে চলে গেছেন।

মায়ের শরীর তেমন ভাল নেই। মুখে অরুচি; পরিশ্রম করতে গেলে বুকে হাঁপ লাগে। ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে বিমলা বলে—শুচিবাই একটু কমাও মা, ওই তোমার যত নষ্টের গোড়া।

সরোজিনী কন্যার কাছে লজ্জিত হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে লে—তা নয় বাছা, কপাল আমার আবার পুড়েছে।

কথাটা আর এগোয় না।

গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসে। পুকুরের ওপারে বাঁশঝাড়ের াথায় কালো কালো মেঘ ঘনিয়ে ওঠে। নারকেল গাছের ড়সড়ে হাওয়ায় পুকুরের জল শিউরে শিউরে কাঁপতে থাকে। মঘের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে দূর মাঠের পথে গরু-বাছুরগুলো ্যাজ তুলে ছুটোছুটি করে। নিম আর কলাগাছের মাথায় মঘের ছায়া নেমে আসে।

চেনা ও জানা

মা বলে—সকাল সকাল কাপড় কেচে আয় মা। বিষ্টি নামলে আর ঘাটে যেতে পারবি নে।

গামছাখানি হাতে করে' নিয়ে বিমলা বাইরে এসে দাঁড়ায়। সরকারদের বাগানে দেবদারু গাছের মাথায় মেঘের পানে তাকিয়ে তার চোখ দুটো যেন জ্বালা করে উঠে। আজকের এই কর্ম্মহীন সজল সন্ধ্যা তার ঠিক কেমন করে' কাটবে তা সে বেশ জানে! ঘরের জানলাটি খোলা থাকবে—জলে-ভেজা হাওয়া মুখে চোখে এসে লাগবে; একটি পিদিম জ্বলবে; মাথা আর মুখের ছায়া পড়বে দেয়ালের গায়ে; সে তখন পড়বে 'সতীনাটক'! এই কিছুদিন আগে সরোজিনী তাকে বইখানি কিনে দিয়েছে!

বুকের ভিতরটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে। এত উদার নব বর্ষার মাঝখানে তার কি কোন ঠাঁই নেই? এই ঝড়, এই বৃষ্টি, এই অন্ধকার, এই মেঘ-মেদুর আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ সে যদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে—তাতে এমন কি অপরাধ! কি অপরাধ, যদি চুপি চুপি সে একটিবার বলে—আমার কোন দোষ নেই! আমি বিধবা কিন্তু আমি নিরপরাধ।

ঝম্ ঝম্ করে' তৎক্ষণে বৃষ্টি নেমে আসে। নারিকেল গাছ-গুলি দুলে' দুলে' ভিজতে থাকে। বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

ধীরে ধীরে বিমলা নেমে যায়। তুলসী মঞ্চের ওপর একটু-খানি বসে; ইচ্ছা করে সমস্ত দেহখানি দিয়ে এই নববর্ষাকে সে একান্ত আপনার করে' নেয়।

চেনা ও জানা

প্রবল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সে আবার উঠে দাঁড়ায়। আজকে শান্ত স্থির হয়ে থাকবার দিন যেন নয়। সমস্ত মনের এপার ওপার যেন আকুল হয়ে উঠেছে। খিড়কির দরজার কাছে এসে সে একবার দাঁড়ালো। অশান্ত বুকের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে কে যেন পদধ্বনি করে' চলেছে। চকিত দৃষ্টিতে সে ঘন ঘন বাইরের দিকে তাকাতে লাগলো।

নারীর সেই চিরন্তন কামনা, স্ত্রীজাতির সেই পরম পরিচয়, চিরদিনের সেই অভিসারের অভিলাষ, অম্বর-অরণ্যে সেই সু ন্তীর কেকাধ্বনি, সব একাকার হয়ে বিমলাকে সুমুখের দিকে ঠেলে দিল!

ভীরু ত্রস্তপদে কয়েক পা গিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে' সে দাঁড়ালো। কোথায় যাবে সে? পথ ত তার জানা নেই! কতটুকু শক্তি তার!

অদূরে ভৈরবীদিদির বোনপো ছাতিটি মাথায় দিয়ে এদিকে আসছিল। হঠাৎ তাকে দেখেই চোখ নামিয়ে তাড়াতাড়ি পিছনের পথ ধরে' বিমলা পুকুরের দিকে চলে' গেল।

ঘাটে নেমে কাপড় কাচ্‌তে কাচ্‌তে তার মনে হলো, ছি ছি, এ কোথায় চলেছিল সে! সংসারে এ মনোবিকারের মূল্য কি?

ঘরে উঠে আসতে সরোজিনী বল্‌ল—এত ডাকৃছি, কোথায় ছিলি রে?

একটু হেসে বিমলা বল্‌ল—ডুব সাঁতার কাটছিলাম মা।

মা বল্‌ল—মরবার ভয় নেই?

বিমলা আবার হাসলো। হেসে বল্‌ল—সেই জন্যেই ত পালিয়ে এলাম! ডুবতে আমার ভয় করে।

এমনি করেই আবার দিন চলতে থাকে।

সরোজিনী বলে—ছুটে ছুটে বেড়াতিস, এখন যে বড় এক যায়গায় বসলে আর নড়তে চাসনে?

বিমলা বলে—মা যেন কি! মেয়ে মানুষের ছুটে বেড়িয়ে কি লাভ?

তা বটে! সরোজিনী আস্তে আস্তে চলে' যায়। জামাইটিকে নিষ্করুণ ভাবে মনে পড়ে। সে থাকলে হয় ত নিশ্চয় এতদিনে বিমলার কোলে একটি ছেলে হতো! তাকে নিয়ে একটু উদ্বেগ, একটু আনন্দ নিশ্চয় ঘটতো। তাকে নিয়ে ছুটে বেড়িয়েও লাভ ছিল,—এই কর্ম্মহীন পীড়াদায়ক অবসরের মধ্যে বসে ছট্‌ফট্‌ করতে হতো না!

শরৎকাল শেষ হয়ে যায়। নীল আকাশ, সাদা মেঘ ও রোদ-বৃষ্টিতে মিশে রামধনুর খেলা আর বিশেষ কারো নজরে পড়ে না। কাশের বন ঈষৎ মলিন হয়ে গেছে, কলা পাতার ওপর এখন শিশির পড়ে, শিউলির গন্ধে এখন আর সে নেশা নেই। শুধু কেবল ভরা নদীর ওপর দিয়ে বহু দূরে হাঁসের দল উড়ে চলেছে—এখনো দেখা যায়।

সরোজিনীর দিন আসন্ন হয়ে আসে। পরিশ্রম করবার অক্ষমতায় শুচিবাই আজকাল তেমন আর প্রখর নয়। বিমলা বলে—তোমার মেয়ে হলে এবার কি নাম রাখবো জানো না? রাধা!

অকস্মাৎ মরা জামাই যেন চোখের সুমুখে এসে দাঁড়ায়। সরোজিনী বলে—পোড়ারমুখি! মেয়ে কেন হবে?

বেশ ত, ছেলে হলে নাম রাখবো—শ্যামল!

হঠাৎ সরোজিনীর চোখে জল আসে। বলে—সে ছেলে তোকেই দেবো বিমলি, তুই নিস্ তাকে, তোর কোলেই মানুষ হবে। আমার আর দরকার নেই!

বিমলা হেসে বলে—তুমি ত বেশ লোক মা? আমি বেচারা এক পাশে পড়ে' আছি, আমাকে দিয়ে ছেলে মানুষ করাবে? কত মাইনে দেবে শুনি?

সরোজিনীও হেসে বলে—আ মরণ! আগের জন্মে তুই নিশ্চয় ঝি ছিলি!

বিমলা খিল খিল করে' হেসে ওঠে। বলে—এজন্মেও তাই।

বিধবার দিন কেমন করে' কাটে তা সবাই জানে। অবারিত অবসরের মধ্যে আনন্দহীন মন চিরকালের জন্যে ছুটি পেয়ে গেছে। প্রতিদিনের শুধু একই চিন্তা—আর কতখানি পথ বাকি!

সরোজিনী বলে—চিঠিও লিখিস্‌নে, বই থেকে পদ্যও টুকিস্‌নে —তবে কাগজ-কলম নিয়ে কি হিজিবিজি করিস্?

বিমলা বলে—ছাই! কী আবার! বসে' থাকার চেয়ে ব্যাগার খাটাও ভাল!

মাথা আর মুণ্ডু!—সরোজিনী বলে—ওই তোর ঘরে একখানা কাগজ পড়েছিল দেখছিলাম; কিছুই বুঝতে পারিনে, আন্দাজ কচ্ছিলাম পুরুষ মানুষের ছবি এঁকেচিস। না?

ঢোঁক গিলে বিমলা বলল—ছবি? পুরুষ মানুষের? কি যে বল তুমি মা তার ঠিক নেই!—বলতে বলতে উঠে তাড়াতাড়ি সে আড়ালে চলে' গেল।

সরোজিনীর দিন সত্যিই আসন্ন হয়ে আসে। এবং সেই আসন্নতার সঙ্গে একটা যেন উদ্বেগের ছায়া ক্রমশঃ ভীতিজনক হয়ে ওঠে। নির্জ্জন দুপুরের নিঃশব্দতায় হঠাৎ ওধার থেকে যেন কার কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যার আলো জ্বলতেই কে যেন কোথা থেকে এসে ফুঁ দিয়ে আলোটা নিবিয়ে দেয়—কিছুই বোঝা যায় না। একদিন তুলসীমঞ্চের ওপর দেখা গেল, কে এসে যেন বসে রয়েছে......

আর একটু হলেই সরোজিনী সেখানে ফিট্ হয়ে পড়ে' যেত। রাতের বেলায় জ্যোৎস্নার আলোয় ছাদের পাঁচিলের ওপর কে চলাফেরা করে—এ ত' প্রায় নিত্যই দেখা যায়। খড়মের শব্দ ত নিতান্তই অভ্যস্ত ঘটনা! সরোজিনীর মনে হয়, এ সেই জামাইয়ের ছলনা! বেচারার না হয়েছে শ্রাদ্ধ, না হয়েছে বা গয়ায় পিণ্ডদান!

আহা থাক্, বাছারে, আর পিণ্ডি নয়! সে ফিরে আসচে! —সরোজিনী বলে—ওসব কিছু না; ভয় অমন একটু আধটু এ সময়ে হয়েই থাকে। এ যা হচ্ছে এ ত' আর সহজ ব্যাপার নয়!

বিমলা হেসে বলে—বাঁচলাম। শুচিবাই ছেড়ে যে তোমায় ভূতের বাই ধরেছে, এ বরং ভাল। এতে হাজা ধরে না,—আনন্দও আছে।

চেনা ও জানা

মধ্যরাত্রে সত্যিই সরোজিনীর ঘুম ছাঁৎ করে ভেঙে যায়। একটি অদৃশ্য পুরুষ তার চারিদিকে যেন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কি যেন একটা কথা তার বলবার আছে। কোনো দিন গভীর ঘুমের ঘোরে স্বপনে দেখা দিয়ে যায়। বলে—মা আমি তোমারই কাছে যাবো।

সকাল বেলা হতেই পূজা-অর্চনা সুরু হয়। নানা দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করতে গেলে এগুলো চাই। গ্রহের কোপ-দৃষ্টি ভাল নয়। এবারের ছেলে যেন বাঁচে!

মায়ের মনোভাব বিমলা কি আর বুঝতে পারে না! লজ্জায় সময় সময় মায়ের কাছেই সে মুখ লুকিয়ে বেড়ায়।

মা বলে—ওই ডুরে কাপড়খানা আছে, ওখানা দিয়ে ভাল কাঁথা একখানা সেলাই করিস। আর নতুন ধোয়া কাপড় আনাবো তাতে ছোট ছেলের পা-জামা হবে!

ভাবী পুত্রটির জন্য ঝুমঝুমি আসে, কাঁচ কড়ার একটা বড় পুতুল আসে। বিমলা বলে—তিন চাকার একখানি গাড়ী তাকে কিনে দিও মা, পুরুষ মানুষের গাড়ী চড়বার সখ বড্ড বেশী।

সরোজিনী বলে—তা ত' দিতেই হবে। ওসব ব্যবস্থা তুই করিস বাছা, ছেলে তোরই হবে—আমি শুধু পেটে ধরবো বৈ ত নয়!

বিমলা হাসতে হাসতে উঠে যাবার সময় বলে' যায়—সোনার পাথর বাটী!

আড়ালে গিয়ে চুপ করে' সে দাঁড়ায়। এদিক ওদিক তাকিয়ে ভাবে, সেই অদৃশ্য পুরুষটির শব্দ সাড়া কিম্বা দর্শন সে ত' কই কোনো দিন মুহূর্ত্তের জন্যও পায় নাই। সেই নির্ম্মম কঠিন আত্মীয়স্বজনহীন জীবনের বন্ধুটি! রোগে দুঃখে উপবাসে যন্ত্রনায় জর্জ্জরিত হয়ে একাকী গভীর অরণ্যের মধ্যে সেই যে প্রাণত্যাগ করেছে—স্ত্রীর সঙ্গে মুহূর্ত্তের সম্বন্ধও কি তার ছিল না? স্বামী হয়ে যে রইল না—অন্যের উদরজাত সন্তান হয়ে সে কোলে থাকবে—এ অপমান সে সইবে কেমন করে'? সে শুধু একটি সন্তান চায়, কেবলমাত্র একটি ছেলে মানুষ করতে চায়—এত বড় মিথ্যা কথা কে আজ প্রচার করতে সুরু করেছে?

মা বলে—হাসচিস যে অত করে?

বিমলা বলে—ভূত হয়ে জঙ্গল থেকে আসতে গেলে রেল ভাড়া ত আর লাগে না, তাই তুমি অত ঘন ঘন দেখা পাচ্ছ!

সরোজিনী একটু রেগে উঠে বলে—দিন দিন বড় হচ্ছিস, হিঁদুয়ানী তোর যাচ্ছে কোথায়?

কিন্তু তিরস্কার করতে গিয়ে কন্যার দিকে ভাল করে' তাকিয়ে মায়ের মুখে আঁর কথা ফোটে না। মাথায় তেল নেই, সীঁথি মুছে গেছে, শুক্‌নো চুলে জট পড়েছে। শীতের হাওয়ায় গালের চামড়া শুকিয়ে উঠেছে, ঠোঁট ফেটে দুই কোণে ঘা ফুটেছে। সংসারের কাজ করে' হাত দুখানি একেবারে শ্রীহীন—সেদিন ঘাটের ধারে আছাড় খেয়ে বাঁ-হাতের ঘাখানা আজও শুকোয়নি। পায়ের গোড়ালি ফেটে গিয়ে রক্ত জমে' আছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপই

নেই। ছেঁড়া কাপড়খানি এত ময়লা যে আর পরা চলে না।

মৃত সত্যবানের প্রাণভিক্ষার জন্য সাবিত্রী যেন ক্ষত বিক্ষত বিধ্বস্ত হয়ে গেছে!

ম্লান হেসে বিমলা বল্‌ল—ঝির মতনই চেহারা হয়েছে, না মা?

মা নিঃশব্দে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চলে' গেল।

কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন নারীটির সেই একই কথা—শ্যামল আসছে! শ্যামল আসছে রথে, হাতীর হাওদায়, সোনার নৌকায়—শ্যামল আসছে পক্ষীরাজের পিঠে।

নিরুপায় একটি তরুণীর অবলম্বনস্বরূপ শিশুর রূপে দেবতা আসছেন স্বর্গচ্যুত হয়ে।

আর রাত্রে সরোজিনীর সেই আদিকালের স্বপ্ন!—সেই শ্বেত হস্তী উদরে প্রবেশ করছে!

মা বলে—রাতে দরজা দিয়ে ঘুমোবি মা! কি জানি যদি ভয়-টয় দেখে···এ বাড়ীতে যে রকম ভয় হয়েছে—

বাড়ীতে হয়নি; হয়েছে তোমার ওপর!—বিমলা বলে।

সেই কথাই ত' বল্‌ছি; ও একই কথা!

রাত্রে প্রতিদিন বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে বিমলার মাথার মধ্যে নানা খেয়াল চেপে বসে। পা টিপে টিপে চোরের মতন ভিতরের দিকে দরজায় কাণ পেতে শোনে. মায়ের আর কোনো সাড়া শব্দ নেই! একটু হেসে সে তখন ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।

রাত ঘন গভীর। বাগানের জান্‌লা দিয়ে একটু একটু হাওয়া আসতে থাকে। পিদিমটা ভাল করে' উস্কে শিখাটা সে উজ্জ্বল ক'রে তোলে। তার পর কুলুঙ্গি থেকে চাবি নিয়ে খুট্ করে' নিজের তোরঙ্গর ডালাটি খুলে ফেলে।

সে যেন চোর! অপরাধীর মত বুকের ভিতরটা তার ধক্ ধক্ করে।

ফুলশয্যার সেই শাড়ীখানি, রেশমের ব্লাউসটি, গায়ে-হলুদের সেই প্রসাধন-আসবাবগুলি, স্বামীর উপহার দেওয়া কাণের দুটি দুল, ননদের মুখ-দেখানি সোনার নোয়া,—সমস্তগুলি সে একে একে বা'র করে' আনে।

তার পর দুল পরে, রুলি নোয়া পরে, ব্লাউস গায়ে দেয়, শাড়ী ঘুরিয়ে পরে; আয়নাটি সুমুখে রেখে চুল বাঁধে, শিশি থেকে আল্‌তা নিয়ে পায়ে লাগায়, ছোট্ট রাঙা একটি কৌটো খুলে কম্পিত হস্তে সিঁদুরের টিপ্ নিয়ে সীঁথির ওপর টেনে দেয়।

প্রথম শীতের কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশ থেকে এতটুকু মৃদু জ্যোৎস্না জান্‌লার ধারে এসে পড়ে।

নিজের হাতে আঁকা সেই অস্পষ্ট বিকৃত স্বামীর ছবিটি সে ডান দিকে বিছানার ওপর রাখে, আর কোলের ওপর রাখে কাঁচ-কড়ার সেই নূতন খোকা পুতুলটি! তার পর সুমুখে পেরেকের গায়ে আয়নাটি ঝুলিয়ে রেখে সে নিঃশব্দে বসে' থাকে। সে যেন সদ্যবিবাহিতা; বিধবা বলে' আর তাকে কিছুতেই চেনা যায় না।

তার মুখের মধ্যে কে যেন হেসে ওঠে। কিন্তু চোখে তার

সুতীক্ষ্ণ কৌতুক কিম্বা সুনিবিড় বেদনা—কোন্‌টা ফুটে আছে তা সে নিজেই বুঝতে পারে না।

তার পর আয়নার মধ্যে নিজের দুটি চোখ আর নজরে পড়ে না। চোখের জল ফেটে পড়ে' সব একাকার হয়ে যায়।

পরদিন পায়ে শুধু আল্‌তার অস্পষ্ট দাগটুকুই নজরে পড়ে।

মা বলে—ও কি রে ?

বিমলা বলে—লাল কালি লাগিয়েছি মা ; পায়ের ঘা ওতে একটু ভাল থাকে।

নাস্তিক আর কাকে বলে! বিশ্বাস করলে বস্তু মেলে—হিঁদুঘরের মেয়ে হয়ে এই চল্‌তি কথাটাও মেনে চলে না। এই মেয়েরাই দুঃখ পায়।

আমি তেমন মেয়ে নই—বিমলা বলে—আজকাল আমি সব বিশ্বাস করি। এই সেদিন রাতে চুপ করে শুয়ে আছি, এমন সময়,—ও কি, ওদিকে অমন করে' তাকাচ্ছ কেন ?

দুটো ঠোঁট সরোজিনীর একবার কেঁপে উঠলো। বড় বড় চোখে চুপি চুপি বল্‌ল—কে যেন দাঁড়িয়েছিল !

চোর বুঝি ?

হঠাৎ রেগে উঠে সরোজিনী বলে—তোর এক কথা! চোর হতে যাবে কেন ?

বিমলার মুখে হাসি এসে আবার ফিরে গেল। বল্‌ল—দিন-

দুপুরে যদি কেউ এসে দাঁড়ায় ত সে চোর ডাকাত ছাড়া আর কিছুই নয় মা। সে যে আত্মীয়-ভূত বলে' ভক্তি করবো তা পারবো না। গায়ের জোরে পুরুষ মানুষের চেয়ে কম নই! হয় লাঠি না হয় বঁটি হাতে নেবো, তা বলে দিচ্ছি।

অদৃশ্য সেই পুরুষটিকে স্মরণ করে' সরোজিনী বল্‌ল—ছি ছি, বিম্‌লি, তোর জ্ঞান আর হলো না দেখছি।

আচ্ছা এবার জ্ঞান হবে, দাঁড়াও।—

তার পর দিন বিমলা বল্‌ল—কাল রাতে কে আমার দরজায় কড়া নাড়ছিল মা, মাইরি বলছি।

অকস্মাৎ সরোজিনী মুখ ফিরিয়ে বল্‌ল—ওই দ্যাখ্, আমি বলেছিলুম! এ ত' মিথ্যে হবার নয়, আমি যে জানি!

রাতের বেলা অন্ধকারে সেদিন হঠাৎ বিমলা অস্ফুট চীৎকার করে' উঠলো। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সরোজিনী তার হাত চেপে ধরে' বল্‌ল—ভয় পেলি বুঝি? কার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' তাকিয়েছিলি?

বিমলা বল্‌ল—সেই যে সে!

কে?

সেই জঙ্গলে যে মরে গেছে, সে!

ভয়ে ভয়ে মা ও মেয়ে এসে ঘরে ঢুকলো। অন্ধকারে বিমলার মুখখানা ভাল করে' দেখা গেল না! তাহলে বোঝা যেত', লজ্জা আর হাসি সে-মুখে এক সঙ্গে খেলে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু সে রাত আর কাটলো না। ভয়ের আঘাতে সরোজিনীর

পেটের মধ্যে ব্যথা ধরেছিল। সে ব্যথায় আকাশ থেকে তারা খসে' পড়ে।

ধীরে ধীরে সরোজিনীর কাৎরাণি বেড়ে উঠতে লাগলো। আগে থেকে সমস্ত ব্যবস্থাই প্রস্তুত ছিল। দাই ডাকতে বিমলাকে কষ্ট পেতে হল না।

সরকারি ভৈরবী দিদিও অনুগ্রহ করে' এলেন।

রাত্রি শেষে একটি অপরিচিত অতিথির সদ্যোজাত নবীন কণ্ঠ-স্বর শোনা গেল।

বিমলা কাঠ হয়ে বাইরে বসে' ছিল। দাই ভিতর থেকে চেঁচিয়ে উঠলো—উলু দাও গো, উলু দাও—ছেলে হয়েছে!

বুকের সমস্ত রক্ত যেন অকস্মাৎ তোলপাড় করে' উঠলো। লাফিয়ে উঠে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বিমলা বল্‌ল—অ্যাঁ, ছেলে হয়েছে জীবুর মা?

—ছেলে হয়েছে, এই কথাই বলতে হয় ভাই। এ আমাদের নিয়ম!

ভৈরবী দিদি বললেন—তা হোক বাছা, বেশ হয়েছে। মেয়ে কি আর মানুষ নয়? এই ত বিম্‌লির মেজ মামী পোয়াতি, ছেলে হলে বিম্‌লিই গিয়ে তাকে মানুষ করবে। আহা, ছোট বিধবা মেয়ে, পরের ছেলে যদি মানুষ করতে পায় ত বাঁচে!

শ্যামল নয়—রাধা!

শ্যামল গেছে মামার বাড়ী!

কুমারী

এক বোঁটায় দু'টি ফুল; একটি গোলাপ আর একটি অপরাজিতা। গোলাপটির গন্ধের চেয়ে ঝাঁঝ বেশী; অপরাজিতাটি মৃদু এবং সলজ্জ।

চঞ্চলার নাকি বিয়ে হবে, পাত্রের খোঁজ চল্‌ছে। ছোট বনলতারও বাড়ন্ত গড়ন—বছর খানেকের বেশী আর হয়ত তাকে রাখা চলবে না। দুটো মেয়ে পাশাপাশি দাঁড়ালে ভয়ে একেবারে গা শিউরে ওঠে।

তবে দিয়ে-থুয়ে পার করবার মত স্বচ্ছল অবস্থা। বাপ আছে, মা নেই। বুড়ি ঠাকুমা কিন্তু আজও বেঁচে আছে। ঠুক্ ঠুক্ করে' গঙ্গাস্নানে যায়, মন্দিরে ঢোকে, ফিরে এসে রাঁধে বাড়ে, বিকালে 'গোপাল বাড়ী' কীর্ত্তন শুন্‌তে যায়, সন্ধার পর এসে মুড়ি দিয়ে শোয়। রাত্রে নাকি বুড়ির রোজ জ্বর আসে।

বাপের বয়সও অনেক। সরকারী চাকুরিতে পেন্‌সন্ পান। একটু হাঁপানির দোষ আছে। কবিরাজের ওষুধ চলে।

চঞ্চলা কালো, মুখখানি সুশ্রী, আনম্র, শান্ত,—চোখদুটি দীর্ঘায়ত, গভীর। চোখের ওপর চোখ রেখে দেখলে তবে সে-চোখ চেনা যায়। বনলতা সুন্দরী, আগুনের আভার মত,—তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। চঞ্চলা স্কুল ছেড়েছে, অত বড় মেয়ে, স্কুলে যাওয়া আর ভাল দেখায় না। বনলতা এখনও যায়, সে অত সব গ্রাহ্য করে না। সামনের বছরে সে ম্যাট্রিক দেবে। লেখাপড়ায় দিদির চেয়ে সে একটু বেশী টন্‌টনে।

বুড়ি হেসে বলে—দেখিস ভাই, খোট্টার দেশ। রাস্তাঘাটে চলিস্‌, কেউ যেন—বুঝলিনে?

তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে বনলতা বলে, পায়ে আমার জুতো থাকে ঠাকুমা, ভয় নেই! একটা ছেলে সেদিন মুখ টিপে হেসেছিল, ইঁট ছুড়ে তার রগ ফাটিয়ে দিয়েছিলাম ঠাকুমা।

শরতের হাওয়া বইছে। দুপুর বেলা পুরুষের ভিড় একটু কমে' গেলে মেয়েরা গিয়ে গঙ্গাস্নান করে' আসে। মেয়ে দুটোকে স্নান করিয়ে উঠে এসে বুড়ি বল্‌ল—দাঁড়া ভাই তোরা একটুখানি, কেদারের মাথায় দুটো ফুল ফেলে দিয়ে আসি। এই যাবো আর আসবো।

ফুল ফেলতে গিয়ে বুড়ির পূজো আর শেষ হয় না।—

ঘাটের দিকে চেয়ে এক সময় বনলতা বল্‌ল, ছাখ্‌ দিদি, ওই ছাখ,—এই জন্যেই আমি নাইতে আসিনে···ওকে দেখলে আমার গা জলে' যায়।

চঞ্চলা সেই তার দিকেই এতক্ষণ তাকিয়ে ছিল। [illegible]

বল্‌ল—এত রাগ কেন ওর ওপর? বাবাকে সেদিন কি রকম বাঁচালো বল দেখি? নিজের হাতে ওষুধ দেয়া, সেবা করা... তুইত তখন স্কুলে!

সে অমন লোকে করেই থাকে। ভারি আমার ডাক্তার! এত যদি দয়ালু তবে আড়াল থেকে আমাদের দিকে তাকায় কেন? লজ্জা করে না?

চঞ্চলা সলজ্জভাবে বল্‌ল—পাশাপাশি বাড়ীতে থাকলে অমন এক আধবার দেখা শোনা হয়ই।

ক্ষুব্ধ আক্রোশে বনলতা দাঁতের ওপর দাঁত চেপে নিঃশব্দে মুখ ফিরিয়ে রইল।

এতক্ষণে স্নান সেরে কাঁধের ওপর গামছা ফেলে ছোক্‌রাটি ওপরে উঠে এল।

হঠাৎ পাশে চঞ্চলাকে দেখে একটু হেসে বল্‌ল—এই যে, চান করতে এসেছিলেন বুঝি?

চঞ্চলা বলল—হ্যাঁ।

বনলতা দুজনের দিকে এক মুহূর্ত্ত তাকিয়ে কয়েক পা সরে' গেল। কাছে দাঁড়িয়ে এমন বেহায়াপনা দেখা তার একেবারে অসহ্য।

ছোকরাটি বলল—বাবা আপনার ভাল আছেন?

ভাল বিশেষ নেই, ওষুধ চলছে।

সেরে উঠবেন, ভাবনা নেই—বলে' ছোকরাটি অন্দরে বুড়িকে বেরিয়ে আসতে দেখেই আবার নিজের পথে চলে' গেল।

বুড়িকে পিছনে রেখে দুই বোনে পথ চলতে লাগলো। অপরিসীম ক্রোধে ফুলতে ফুলতে মুখ রাঙা করে' এক সময় বনলতা বল্ল—ইষ্টুপিড্! পথে ঘাটে মেয়েদের সঙ্গে হেসে কথা বলতে লজ্জা করে না!

চঞ্চলা বল্ল—ছি, গালাগাল দেওয়াটা কিন্তু ভাল দেখায় না বুনি। ভদ্রতা রক্ষা করতে কথা বলাটা অন্যায় নয়।

ওরে আমার ভদ্রতা! দিন দিন এ ভদ্রতা না বেড়ে গেলেই বাঁচি। আঠারো বছরের মেয়ে গেলেন পঁচিশ বছরের ছেলের কাছে ভদ্রতা রক্ষা করতে—এ কথা শুনলে লোকে কি বলবে শুনি? আমি কিন্তু বাবাকে বলে' দেবো দিদি, তা বলছি।

একটুখানি হেসে চঞ্চলা বল্ল—তা দিস, এখন চুপ করে' হেঁটে চল্।

রাগে প্রায় অন্ধের মত বনলতা বলল—একেবারে মরিয়া—কেমন? এ কিন্তু আমি হ'তে দেবো না, এই বলে রাখলাম। আমি বেঁচে থাকতে এসব চলবে না।

বাড়ী গিয়ে খানিকক্ষণ দুই বোনে ঝগড়া চললো কিন্তু হার হলো চঞ্চলার। সে বল্ল—আচ্ছা বেশ, সব মানলাম; কিন্তু পুরুষ মানুষের ওপর এত রাগ তোর কেন শুনি?

রাগ? রাম বল, রাগ নিজেরই ওপর। আমরাই ওদের সাহস দিই নৈলে ওদের সাধ্যি কি যে,—তুমি যদি ওখানে কথা না বলে' মুখ ফিরিয়ে নিতে কিম্বা ধমকে দিতে তা হলে কেমন হতো বল দেখি?

ছি বুনি।—বলে' চঞ্চলা উঠে চলে' গেল। গেল বটে কিন্তু যাবার আগে বনলতার মুখের অবস্থাটা একবার ভাল করে' দেখে গেলে ভালই হতো!

কিন্তু বনলতা ছাড়বার মেয়ে নয়। সেদিন থেকে সে একেবারে বড় বোনের কড়া সমালোচক হয়ে দাঁড়াল। চঞ্চলার ভাবভঙ্গী গতিবিধি, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি অখণ্ড মনোযোগের সহিত সে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। তার চোখ এড়িয়ে কিছুই যে ঘটতে পারে না—এজন্যে তার আত্মপ্রসাদও বড় কম হলো না। চঞ্চলার যে কোনো অপরাধের জন্য সেই যেন সম্পূর্ণ দায়ী, এই মনোভাব নিয়ে তার অশান্তির আর অন্ত নেই।

—ওকি, সাড়ীখানা ঘুরিয়ে না পরলে আর চলে না, আগে ত তোমায় এমন করে' কাপড় পরতে দেখিনি দিদি?

চঞ্চলা বললো—চিরকাল কি আর একরকম চলে?

চলতেই হবে! তা বলে'—বাঃ, এ যে বেড়াতে যাবার সাজ-গোছ হচ্ছে দেখছি। কোথায় যাওয়া হবে শুনি?

কোথাও না, নিয়েই বা কে যাবে! ছাদে গিয়ে বসি গে।

না না, ছাদে তোমার যাওয়া চলবে না দিদি; বিকেল বেলা ছাদে ওঠা ভাল নয়। মেয়ে মানুষের এত ঘন ঘন হাওয়া বদল না করলেও চলবে। মাগো, কালো পায়ে আবার আলতা মাখালো কেন? মাথার ওকি ছিরি? এলো খোঁপা না ফিরিয়ে বিনিয়ে বাঁধলেই ত হতো! তুমি যাই বল দিদি, রূপ দেখাবার চেষ্টা করলেই সুন্দর হওয়া যায় না!

চঞ্চলা হেসে বল্‌ল—আঃ তোর কথার মাত্রাজ্ঞান নেই বুঝি।

তা না হোক, তুমি কিন্তু এ রকম করতে পাবে না।—বলে' বনলতা একদিকে হন্‌ হন্‌ করে' চলে' গেল।

চঞ্চলার কোনো আঘাতকেই সে আমল দেয় না। বয়সে বড় হলেও চঞ্চলা যে সাধারণ অভিজ্ঞতা, সহজ বুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টির ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক ছোট—একথা বনলতা কিছুতেই ভুলতে পারে না। এ জন্যে বড় বোনের ওপর তার করুণারও সীমা নেই।

—যখন তখন অমন চুপ করে' বসে থাক কেন দিদি? সংসারের কাজ তুমি ত এক রকম ছেড়েই দিয়েছ দেখছি। লেখা-পড়াও ছেড়ে দিয়েছ—সুতরাং এ কথা আর জানবে কি করে' যে মাথা খালি থাকলেই খেয়ালে পেয়ে বসে! আজ ইস্কুল থেকে এসে যেন দেখি তুমি বই খাতা নিয়ে বসে আছ। গোটাকতক আঁক দিয়ে যাবো কস্‌বে বসে' বসে'?

আরে না না, কেন বাজে বকিস?

বাজে! আমি বাজে বকি—কেমন? ক্রমে সবই বুঝতে পাচ্ছি দিদি।—রাগে গর গর করতে করতে বনলতা চলে' যাচ্ছিল; ফিরে দাঁড়িয়ে আর একবার বলে' গেল—বয়েস আমারও কম হয়নি দিদি, বিয়ে হলে এতদিন ছেলের মা হতাম। এ রকম কাণ্ড সবই বুঝতে পারি। বুঝলে?

লজ্জায় মুখ লুকিয়ে হাসতে হাসতে চঞ্চলা একদিকে পালিয়ে গেল।

পসার এখনও ভাল করে' জমেনি। সারাদিনে গুটি চার পাঁচ রুগী আসে আর একটি কিম্বা বড় জোর দুটি 'ডাক।' বিদেশের লোকের স্বাস্থ্য একটু ভালই তাই ঔষধ পত্র এনে জমিয়ে রাখতে সাহস হয় না। যারা একটু আধটু শিক্ষা দীক্ষা পেয়েছে তারাই ডাক্তার দেখাতে আসে; বাদবাকী সবারই মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা।

নীচে আর ওপরে দুটি ঘর। নীচেরটিতে দোকান আর ওপরেরটিতে শোবার ব্যবস্থা। একটি মাত্র বাইরের লোক আছে। নাম—মহারাজ। সে একাধারে চাকর, বামুন, দারোয়ান এবং সরকার। খাওয়া-পরা পনেরো টাকা মাস-মাইনে। রাত্রে সে 'দোস্তির' বাড়ীতে শুতে যায়—আবার কাক না ডাকতেই ফিরে আসে। লোকটা বিশ্বাসী।

—তুমি নিজের একটা যা হোক হিল্লে করে' নিয়েছ—কি বল মহারাজ?

সেবার লাঠি খেলতে গিয়ে মহারাজ সুমুখের দুটো দাঁত ভেঙে আসে। এক মুখ হাসি হেসে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে বলে—মেহের-বান বাবুজি।

মেহেরবান আমি খুব। দয়া একেবারে চারিদিকে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছি।—বলে' বিনয় হো হো করে' হেসে ওঠে। এই হাসির সঙ্গী তার কেউ নেই। নিজের পরিচ্ছন্ন ঘরখানির মধ্যে নিজেই একটি ছোট্ট পৃথিবী সৃষ্টি ক'রে নানা খেয়ালের তুলি বুলিয়ে তাকে রঙীন করে' রাখে। ঘরের দক্ষিণ দিকে দুটি খোলা জানলা। যেন

দুটি বোন। একখানি রৌদ্রজ্জ্বল নীল আকাশকে তারা যেন দুজনে ভাগ করে' নিয়েছে। জোরে জোরে হাওয়া বইলে দুটি জান্‌লাই লজ্জায় বন্ধ হয়ে যায়।

খাওয়া দাওয়ার পর দুপুর বেলা ইজি চেয়ারে শুয়ে বিনয় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাঙলা কবিতা পড়ে। বলে—একটা লাইনও বুঝতে পারিনে, বুঝলে মহারাজ? তবু ভাতগুলো হজম করতে হবে ত!—বেটা গেল কোথায়? সাড়া দেয় না কেন?

উঠে এদিক ওদিক তাকাতেই নজর গিয়ে পড়লো ও-বাড়ীর সিঁড়ির কাছের জান্‌লায়। জান্‌লার কাছে দাঁড়িয়ে এদিকে চেয়ে চঞ্চলা তখন হাসছে। জিব কেটে মুখ লাল করে' বিনয় বল্‌ল—লুকিয়ে লুকিয়ে শুনলেন আমার কাব্যচর্চ্চা?

চঞ্চলা বল্‌ল—বনলতা স্কুলে গেছে, এখনই ত শোনবার সময়। আপনি বুঝি কবিতা লেখেন?

আমি লিখবো কবিতা? হা ভগবান, এতদিনে এই দুর্ণাম! আমার মধ্যে কোন ধোঁয়ার খোঁজ পেয়েছেন নাকি? আচ্ছা, ছোট বোনটিকে এত ভয় করেন কেন?

একটুখানি হেসে চঞ্চলা বল্‌ল—না করে' উপায় কি বলুন? ও একেবারে বুনো ঘোড়া, মাথা উঁচিয়ে একবার ছুট্‌লে আর কারোকে কেয়ার করে না! ভারি একগুঁয়ে!

বিনয় বল্‌ল—আমার ওপর তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট নন্—কেন বলুন ত?

সে এমনিই।—চঞ্চলা হেসে বল্‌ল—জগতটা যেন তার মেজাজের মুখ চেয়ে থাকে!

জানলাটি ছোট কিন্তু সেখান থেকেই বিনয়ের সমস্ত ঘরটা দেখা যায়। ঘর ত নয়, যেন হরি-ঘোষের গোয়াল। একটু আগে সে ঘরে যেন যুদ্ধ হয়ে গেছে। মুখ বাড়িয়ে চঞ্চলা বল্‌ল—শোবার ঘর লোকে অমনি অপরিস্কার রাখে? একেবারে যে ডামাডোল!

বিনয় আবার হো হো করে' হাসলো। বল্‌ল—বুঝেছি, কথা খুঁজে না পেলে লোকে আপনার মতন অনেক বাজে কথা বলে। আমার ঘর সত্যি সত্যিই পরিস্কার, এ পাড়ার কারো শোবার ঘর এমন নয়—আমি বাজি রেখে বল্‌তে পারি।—

কথা বলার অভ্যাসটা বিনয়ের এই রকমই। তর্ক করে' সে সাপের বিষ পর্য্যন্ত উড়িয়ে দিতে পারে।

—আমি কিন্তু বেশ থাকি তা আপনারা যাই বলুন। সবই পাবেন, কিছুরই অভাব নাই আমার ঘরে। ওই দেখুন 'ষ্টোভ', —মাংস ডিম কপি, ভাল ভাল তরকারী এনে নিজেই 'ফিষ্ট্' করি —নিজেই ওড়াই। মহারাজ বেটা গোঁড়া হিন্দু হয়ে ভারি সুবিধে হয়ে গেছে। এবার দেখুন না ভাল 'ডিনার টেবল্' আনাচ্ছি, সঙ্গে দুটো ফুলদানী।—ওই যে ন্যাড়া পাঁচিলটা দেখছেন ওর ওপর টবে করে' ডালিমের চারা বসাবো—লাল লাল ফুল ফুটবে, আর মৌমাছি এসে ঘুর ঘুর করে' যাবে। আর নীচে যে ওই খালি জায়গাটুকু পড়ে' আছে, ওখানে—নাঃ, এখন বললেই সব মাটি হয়ে

যাবে; এখানে আছেন যখন তখন সবই একে একে দেখতে পাবেন।—বলে' হেসে তাকাতেই চঞ্চলা বল্‌ল—কেবল একটি জিনিসের অভাব আছে!—বলেই সে জান্‌লার একটা কপাটের পাশে মুখখানিকে লুকিয়ে বসলো।

বিনয়ের সেই নিরুদ্বেগ, সরল এবং শান্ত মুখখানি হঠাৎ যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে মাথা তুলে বল্‌ল—বুঝেছি আপনার কথা; কি উত্তর দেবো তাই চট্ করে' ভেবে নিলাম।

উত্তরটি কি শুনি?—ভুরু কুঁচ্‌কে মুখ টিপে চঞ্চলা চেয়ে রইল।

ভাবছিলাম বাঙলা দেশে একটি মাত্র মেয়ে সুখী, আমি যাকে বিয়ে করিনি। আর তা ছাড়া—

চঞ্চলা বল্‌ল—বেশ, বাহাদুর আপনি। এখন আপনার ওই কবিতার বইটা দিন দেখি, কাল আবার এই সময় ফেরৎ দেবো।

বইটা নিয়ে বারান্দার কাছে এসে বিনয় বল্‌ল—ছুড়ে দিচ্ছি, লুফে নিন্। আমার হাতে বেশ টিপ আছে। ছোট বেলা খুব ভাল গুলি খেল্‌তে পারতাম। ধরুন্।

ছুড়ে দিল বটে কিন্তু সেখানা চঞ্চলার হাত অবধি পৌছল না—জান্‌লার গরাদে লেগে নীচে পড়ে' গেল।

ওই যা—বলে' তাড়াতাড়ি উঠে নেমে আসতেই মাঝপথে বনলতার সঙ্গে দেখা। সে তখন স্কুল থেকে ফিরছে। চঞ্চলাকে দেখে আরক্ত দৃষ্টিতে বল্‌ল—গায়ের ওপর বই ফেলে আমাকে অপমান করা? আমাকে অপমান!

বনলতা আর কিছু বল্‌ল না। খাতাপত্র রেখে কবিতার বইটা হাতে নিয়ে খট্‌ খট্‌ করে' বেরিয়ে গেল।

বিনয় তখন নিরুপায় লজ্জায় নীচের ঘরে বসে' আছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বইখানা ভিতরে ছুড়ে দিয়ে বনলতা বল্‌ল—নিন্‌। কবিতার বই দিয়ে আমাকে নরম করা শক্ত। কাউকে কিছু বলবো না; এবারের মতন চুপ করে' গেলাম। কিন্তু দিদির মতন আমি কাউকে কেয়ার করিনে এটা জানিয়ে যাচ্ছি।

বিস্মিত বিনয়কে কিছুই বলতে না দিয়ে বনলতা যেমন এসেছিল তেমনিই আবার চলে' গেল।

ভয়ে বিবর্ণ মুখে চঞ্চলা দোরের কাছে দাঁড়িয়েছিল। ঘরে ঢুকে গম্ভীর ভাবে বনলতা কাপড় ছাড়তে লাগলো। চঞ্চলা বল্‌ল—কি বল্‌লি? যা তা বলে' এলি ত?

কোন কাজের কৈফিয়ৎ দেওয়া বনলতার পক্ষে যেন নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। তবু তাচ্ছিল্য কণ্ঠে বল্‌ল—আমার ভদ্রতা জ্ঞান একটু কম তা বলে' কমন্‌ সেন্স্‌টা কম নয় দিদি। শুধু বলে' এলাম, ওসব চলবে'না।

বেশ করেছিস।—বলে' হেসে চঞ্চলা চলে' গেল।

জলযোগ করে' একটু ঠাণ্ডা হয়ে দিদিকে ডেকে বনলতা বল্‌ল—আমি ইস্কুল যাবার পর সারাদিন তুমি কি কর শুনি? আঁক কসা ত বন্ধ করে' দিয়েছ! সেলাইয়ের কাজটা দিলাম, 'একদিনের কাজ, তুমি আটদিনেও শেষ করতে পারলে না। তোমার একটু শাসন হওয়া দরকার দিদি।

তাই না হয় কর—বাবার ছড়িটা এনে দি[illegible]।

ঠাট্টা আমি ভালবাসিনে। দুপুর বেলা আজকাল কি হচ্ছে আমায় বলতেই হবে!

চঞ্চলা বল্‌ল—কি আবার হবে! হয় ঘুমিয়ে পড়ি না হয় মহাভারত পড়ি।

মাথা নীচু করে বিজ্ঞের মত বনলতা বল্‌ল—তা মহাভারত পড়া ভাল অনেক জিনিস জানবার আছে। তবে তোমার বয়সী মেয়ের আগাগোড়া মহাভারত পড়া তেমন ইয়ে নয়। যে অংশগুলো লুকিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে সেগুলো বাদ দিও, না হয় আমি দাগ দিয়ে দেবো'খন। ও কি, ও জান্‌লাটা আবার কে খুললো?

তাড়াতাড়ি জানলাটা বন্ধ করতে গিয়ে দেখে, বিনয় বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে! সশব্দে মুখের ওপরেই জান্‌লাটা বন্ধ করে দিয়ে সরে এসে বনলতা বল্‌ল—বাবাকে বলে' এ বাড়ীটা ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে, আর নয় ত ডাক্তার অন্য কোথাও যাক্।

যাবার সময় চঞ্চলা বলে' গেল—সেই ভালো বুনি, তোর দুঃখু দেখতে পারিনে!

ঘরে ঢুকে বিনয় একটু চম্‌কে উঠলো। কার পায়ের শব্দ এই মাত্র যেন এ ঘর থেকে মিলিয়ে গেছে। একটি অপরিচিত ঝিলমিলে বাতাস ঘরের চারিদিকে যেন ভুর ভুর করছে। এ যেন ঠিক হাওয়া নয়—কা'র নিশ্বাসের আমেজ। ঘরের সমস্ত জিনিসপত্রগুলি হাসতে হাসতে ঠিক যেন কার আগমনের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সে ত' নিজে ঝড়, যতক্ষণ থাকে ঘরটাকে ওলোট পালোট করাই তার কাজ। কিন্তু যে এসেছিল সে ত' ঝড় নয়—সে বসন্ত। আপনাকে সে সর্ব্বস্বান্ত করে' ফুল ফুটিয়ে গেছে।

ইজি চেয়ারে আর বসা হলো না; পায়চারি চলতে লাগলো। ওখানে ওই বইগুলি—বাঃ চেহারা ফিরে গেছে যে! চিঠি না ওখানা?

বই চাপা পত্রখানি তুলে নিয়ে বিনয় এক নিশ্বাসে পড়লো—'ডাকতে এসেছিলাম, পেলাম না। চিঠি পেয়েই একবার আসুন। বাবার হাঁপানিটা একটু বেড়েছে। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। —চঞ্চলা দেবী।' পুঃ—চিঠির কথা যেন বনলতা টের না পায়।'

বাক্সর মধ্যে চিঠিটা রেখেই বিনয় ছুটলো।

অন্দর মহলটা বেশ পরিচিত। ওপরে উঠতেই চঞ্চলা হেসে বল্‌ল—আসুন, বাবা জেগেই আছেন।

জেগেই ছিলেন। সাড়া পেয়ে মুখ ফিরিয়ে বললেন—এসো বাবা, এখন একটু ভাল আছি। টানটা কিছু কম পড়েছে। তোকে বললাম না ওকে আর এখন বিরক্ত করিসনে, তুই শুনলিনে।

চঞ্চলা বল্‌ল—আমরা বিরক্ত না করলেও অন্য কেউ করতো!

বিনয় বল্‌ল—তা ত নিশ্চয়ই। বিরক্ত করলেই আমাদের পেট চলে। আজ কিন্তু আপনার ওষুধটা বদলে দিয়ে যেতে হবে। হাতটা একবার দেখি?

হাতের নাড়ী পরীক্ষা করে বিনয় বল্‌ল—ভালই আছেন; তবে ভারি দুর্ব্বল! কাগজ-কলমটা একবার দিন ত?

চঞ্চলা তাড়াতাড়ি লেখার সরঞ্জামগুলি এগিয়ে দিল। ছোট

একটি 'প্রেসক্রিপসন' লিখে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিনয় বল্‌ল—এটা খাইয়ে কেমন থাকেন কাল সকালে যদি একবার খবর দেন ত,—আজ যাচ্ছি।

ওকি, না না, সে হবে না বাবা। ফি-র টাকাটা—

মাপ করবেন—বলে' বেরিয়ে আসতেই একেবারে বনলতার মুখোমুখি। ভিতরে ঢুকে বনলতা বল্‌ল—দাঁড়ান, অত দয়ালু নাই-বা হলেন! দাও দিদি টাকাটা—বলে' এগিয়ে এসে চঞ্চলার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে আলগোছে সে বিস্মিত, ক্ষুব্ধ বিনয়ের হাতের ওপর ফেলে দিল। বল্‌ল—এ রকম ডাক্তারী কিছুদিন চালালে লোকে আপনাকেই রুগী বলে' ঠাউরে নেবে। তা' বলে' কিছু মনে করবেন না যেন।

বেশ যা হোক—বলে' বিনয় বেরিয়ে নীচে নেমে গেল।

চঞ্চলাও আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। আজ তার একটু রাগ হয়েছিল। মুখ রাঙা করে বল্‌ল—বাহাদুর মেয়ে তুই বুনি। কিছুই তোর আটকায় না। লোককে অপমান করাটা যেন তোরই একচেটে।

বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে কর্ত্তা খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে রইলেন। রুগ্ন মুখে একবার একটুখানি হাসলেন, পরে নিজের মনেই মৃদু কণ্ঠে বললেন—যদি হয় ত মন্দ হয় না!

আবার তিনি পাশ ফিরে শুলেন।

একটু পরে ঘরে ঢুকে বনলতা বল্‌ল—বাবা জেগে আছেন?

বাবা মুখ ফিরিয়ে বললেন—কেন ছোট মা?

আচ্ছা, একি ভাল বাবা? এই যে ডাক্তার আপনাকে হাতে রেখে চিকিৎসা কচ্ছে।

সে কি?

তাই ত মনে হচ্ছে! নৈলে রোজ একবার করে' আসবার তাঁর কি দরকার? এ শুধু টাকা নেবার ফন্দি বৈ ত নয়।

ছি মা, একি বলতে আছে! ঘরের ছেলের মতন—এসেই বা! টাকা ত নিতেই চায় না, আমরাই জোর করে'—

এই কথাগুলিতেই বনলতা বেশি ক্ষুব্ধ হয়। ডাক্তারের সঙ্গে এতখানি অকারণ আত্মীয়তা—তার গায়ে যেন বিষ ছড়িয়ে দেয়। বল্‌ল—আচ্ছা বেশ বাবা, টাকা উনি নিচ্ছেন, টাকাই নিন্‌, তা বলে' ঘরের ছেলের মতন আর হয়ে কাজ নেই।—বলে' সে দুম্‌ দুম্‌ করে' ঘর থেকে বেরিয়ে চলে' গেল।

রাগে তার সর্ব্বশরীর জ্বালা করছিল, একটা কিছু কাজ নেবার জন্যে পড়বার ঘরের কাছে আসতেই ঘুল্‌ঘুলির ফাঁক দিয়ে ও-বাড়ীর বারান্দায় বিনয়কে দেখা গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে আসছিল তবু মনে হল লোকটার সুগঠিত গৌরবর্ণ দেহে অতিরিক্ত শক্তি, চোখ দুটো উদার, চওড়া কপাল, মাথার চুল পিছন দিকে ফেরানো, মুখে ছোট ছেলের মত একটী উদ্দেশ্যহীন হাসি—অনেকগুলি সাধারণ যুবকের মাঝখানে নিজের একটি অখণ্ড বিশেষত্ব নিয়ে দাঁড়াতে পারে। আজ প্রথম বনলতা তাকে ভাল করে' দেখলো। বল্‌ল—বাইরে রূপ থাকলে কি হবে, হাড়ে হাড়ে দুষ্টুমি একেবারে জড়ানো।

চঞ্চলা কখন্ এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিল। বল্‌ল—তা হোক গে, দুষ্টুমি যার আছে তার আছে—আমাদের কি?

হঠাৎ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বনলতা মুখ ফিরিয়ে তাকালো। একটু হেসে চঞ্চলা বল্‌ল—কিন্তু কেমন দেখলি তাই বল।

বনলতা একেবারে ফেটে উঠলো। বল্‌ল—আস্পর্দ্ধাটা একবার ভাল করেই দেখছিলাম! পরের বাড়ীর জান্‌লার দিকে এমনি নজর করে' থাকা! শেম্‌লেস ক্রিচার!

ও কথাটা তোর পক্ষেও খাটে বুনি।—বলে' চঞ্চলা গিয়ে ঘরে ঢুকলো।

সেইদিনই রাত্রে বারান্দার কাছে গিয়ে খড়ি দিয়ে দেয়ালের গায়ে বড় বড় অক্ষরে বনলতা লিখলো—'এই বাড়ীর দিকে চেয়ে দেখা কোনো পুরুষের পক্ষে একেবারে নিষেধ।'

এবং পরদিন লেখাটার ফলাফল সম্বন্ধে জানবার জন্য সে অতিশয় ব্যগ্র হয়ে উঠলো। গোপনে বিকাল বেলা ছাদের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে দেখলো, বারান্দার দিকে চেয়ে কৌতুকহাস্যে ছোক্‌রা ডাক্তারটির মুখখানা ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। এবং সেইদিকেই চেয়ে কা'কে যেন বলছে—আপনার ছোট বোনটির মাথায় একটু ছিট্ আছে, কি বলেন?

রাগে যেন চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। ছিট! তবে সে পাগল? মানে, মাথা খারাপ—কেমন?

চঞ্চলা বলছে—তা বলে আপনি কিছু মনে করবেন না যেন।

না না, সে কি, ছেলে মানুষ এমন করেই থাকে। মনে কি করবো?

পা দুটো যেন বনলতার টল্‌তে লাগলো। গায়ের প্রতি লোমকূপে কে যেন লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে। সে ছেলে-মানুষ! অর্থাৎ দুনিয়ার কিছু সে বোঝে না! ইস্কুলের কোন বান্ধবী একবার তাকে এই আখ্যা দিয়েছিল বলে' সে তার গায়ে নখ ফুটিয়ে রক্ত বার করেছিল।

অপমানের জ্বালায় বনলতার কান্না এল।

এর প্রতিশোধ চাই!

নীচে নেমে বারান্দায় এসে দেখলো, চঞ্চলা সরে গেছে; ও-ধারে বিনয় দাঁড়িয়ে। বল্‌ল—মেয়েদের দিকে চেয়ে হাঁ করে' কি দেখা হচ্ছে শুনি? ডাক্তার বলে' কি মাথা কিনেছেন?

তার তীব্র মূর্ত্তির দিকে চেয়ে অকস্মাৎ হো হো করে' হেসে উঠে বিনয় ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

তার পরদিন ইস্কুল যাবার আগে একখানি চৌকো টিনের পাত্‌ দড়ি দিয়ে বেঁধে বনলতা বারান্দায় ঝুলিয়ে দিয়ে গেল। তাতে লেখা—'গাধা'। এবং ফিরে এসে সেটাকে আর দেখতে না পেয়ে রাগে গিস্‌ গিস্‌ করতে করতে বল্‌ল—দিদি?

কেন রে?

আমার 'গাধা' কোথায় গেল?

চঞ্চলা একটু হেসে বল্‌ল—ও বাড়ীতে।

সে আবার কি?—বলে' বনলতা জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে

দেখলো, তার দড়ি বাঁধা 'গাধা' ডাক্তারের বারান্দায় ঝুলছে। বল্‌ল—কি ক'রে গেল?

চঞ্চলা বল্‌ল—বোধ হয় বাবাকে দেখে যাবার সময় নিয়ে গেছেন!

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বনলতা বল্‌ল—নিজের বাড়ীতে 'গাধা' টাঙানো হলো! তার মানে, আমি যদি ওদিকে তাকাই তা হলে আমি 'গাধা'—কেমন? চোর কোথাকার!

দুম্ দুম্ করে' ঘরে ঢুকে সে খাটের বিছানার ওপর মুখ থুবড়ে পড়লো। তার সমস্ত রাগ ঘুরে এল এই বিছানাটারই ওপর। মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে তিন চারটে বালিশ প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধ'রে দুহাতের দশটা আঙুল দিয়ে তাদের উপর নিষ্ঠুর নির্য্যাতন করতে লাগলো। অপমানে রাগে দুঃখে আর প্রতি-শোধ-স্পৃহায়—যদি সে একবার চীৎকার করে' কাঁদতে পারতো তাহলে হয়ত ভাল হতো।

পরের দিনটা শনিবার। দুপুর বেলা ইস্কুল থেকে ফিরে এসেই বইখাতা রেখে বনলতা বল্‌ল—ডাক্তারের বাড়ীতে যে আমার কোনো চিহ্ন থাকে এ আমি চাইনে। টিনের পাত্‌খানা তুমি ফিরিয়ে আনো দিদি। তা হলেই ওর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ আমাদের মিটে যাবে। বাবার অসুখও অনেক কমে' গেছে, দরকার হলে গোপাল কবরেজকে ডাকলেই চলবে। তুমি গিয়ে ওটা আনো, তা হলেই—বাস।

চঞ্চলা হেসে বল্‌ল—তা এনে দিচ্ছি।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার দিদির দিকে চেয়ে বনলতা বল্‌ল—কিন্তু যাবে আর আসবে; এক মিনিটের বেশি দেরী হওয়ার কোনো কারণ নেই। চল, আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে, দরজায় গিয়ে দাঁড়াবো।

দুজনে নেমে এল। চঞ্চলা ভিতরে ঢুকে ওপরে উঠে গেল। দোকান আগলে মহারাজ বসে ছিল, ওপরে যাবার জন্য সে বনলতাকেও অনুরোধ জানালো। বনলতা বল্‌ল—বাবু তোমার ভারি পাজি মহারাজ, তার বাড়ীতে পা দিতে আমি ঘৃণা বোধ করি।

মহারাজ হেসে আবার কল্‌কে টানতে লাগলো। কি ভাগি, সে বাঙলা বোঝে না!

তন্দ্রা এসেছিল; বিনয় জেগে তড়াক্‌ করে' উঠে বসলো। হঠাৎ হেসে বলল—এতক্ষণ আপনাকেই স্বপ্ন দেখছিলাম! সত্যি বলছি, আপনি যেন—

মনে হলো চঞ্চলা ত কালো নয়—শ্যামাঙ্গী। মুখখানির ওপর একটি করুণ শান্ত ছায়া জড়িয়ে আছে; ডাগর দুটি চোখ যেন দুখানি সঙ্গীত; হাত পা গুলি নিটোল। মনে হলো, একটী লতার মত একজনকে আশ্রয় করে' সে উঠে দাঁড়াতে চায়; একটি সরল আত্মসমর্পনের ভাব তার মুখে মাখানো।

বিনয় উঠে দাঁড়ালো; দাঁড়িয়ে কাছে গেল, গিয়ে বল্‌ল—আমি তোমায় ভালবাসি চঞ্চলা।

চঞ্চলা থতমত খেয়ে একটু হেসে সরে' যাবার চেষ্টা করতেই

বিনয় তাকে দুই হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে মুখের ওপর মুখ রেখে চুম্বন করতে করতে বল্‌ল—এতে অন্যায় কিছু নেই—বুঝলে?

হঠাৎ চোখের ওপর যেন নাটকের একটি দৃশ্য অভিনয় হয়ে গেল!

এদিকে এক মিনিটের বেশী হয়ে যেতেই বনলতা চীৎকার করে' উঠলো—দিদি?

চঞ্চলা উত্তর দিল—যাচ্ছি, সেটা খুঁজে পাচ্ছি না!—এবার ছাড়ো, কেউ আবার—আঃ—বলে' হেসে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে টিনের পাতটা হাতে করে' সে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল।

তুমি যেন কি দিদি! অত হাঁপাচ্ছ কেন? আমি কি এত ছুটে আসতে বলেছিলাম? চুল এলো করে' আলুথালু হয়ে, মুখ রাঙা করে,—আশ্চর্য্য মেয়ে যা হোক!

চুম্বনের সে উত্তাপ তখনও মুখ থেকে মোছেনি; প্রণয়ের প্রথম স্পর্শে কুমারী বুকের অবাধ্য কাঁপুনি—তাও চঞ্চলাকে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে করে' ফেলেছিল।

ওপরে উঠে টিনের 'গাধা'টি নাড়তে নাড়তে বনলতা বলল—যাক্, সব চুকে গেল এতদিনে। বাঁচলাম!—তুমিও আর ওর সঙ্গে কথা বলো না, দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নিও। আর যদি কখনো বাবা আর আমি ওর সম্বন্ধে আলোচনা করি, তুমি সেখান থেকে উঠে যেও। বুঝলে?

অন্যমনস্ক হয়ে চঞ্চলা বলল—দেখা যাবে।

তার মানে?—মুখের দিকে চেয়ে বনলতা বল্‌ল—যাই বল,

তোমার জন্যে আমার ভয় করে' দিদি। মাঝে মাঝে তোমার এই চুপ করে' থাকা দেখলে আমি শিউরে উঠি।

শিউরে ওঠবারই কথা।

দেনা-পাওনা এমন করে' শেষ হবার পরেও দেখা যায়, দু'একদিন অন্তর বিনয় এক আধবার এসে কর্তাকে দেখে যায়। সে যে এসে শুধু রোগ আর ওষুধ পত্রের সম্বন্ধেই আলোচনা করে তাও ত তার মুখ দেখলে মনে হয় না। চঞ্চলা যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেছে; সে গাম্ভীর্য্য ঠিক ফল্গুর মত। কিছুই বুঝতে না পেরে বনলতা একবার গিয়ে গোপনে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল, বাবা ভিতর থেকে বললেন—বিনয় কিছু মনে করতে পারে, যদি আমাদের কথা শুনতেই হয় ত ভেতরে এসো ছোট মা।

বনলতা আহত হয়ে ফিরে গিয়েছিল।

তারপর সে এক রহস্য!

বলে—মুখ টিপে নিজের মনে অমন হেসো না দিদি, গা জ্বলে যায়!

চঞ্চলা হেসে বলে—তুই যে জ্বলে জ্বলেই গেলি!

এরকম মন্তব্য বনলতা গ্রাহ্যই করে না। কিন্তু মনে মনে অস্থির হয়ে উঠে বলে—যার দিকে চাই সবাই চুপ চুপ—এর মানে কি? তা হলে আমাকে লুকিয়েও এ সংসারে অনেক কথা চলে?

চঞ্চলা বলে—আমাকে কেন যখন তখন ধমক দিস বল্ ত?

তবে কাকে ধম্‌কাবো শুনি? বাবাকে? তোমাকে? না

তোমার ওই গুণ্ডো ডাক্তারটাকে? উল্টে ধমক খাবার ভয় নেই আমার?

খিল খিল করে বঞ্চলা হেসে ওঠে।

হেসো না যখন তখন, হাসি আমার দু'চক্ষেব বিষ!—বনলতা হন হন্ করে চলে' যায়।

সেদিন দুপুরে চঞ্চলা বিনয়ের দরজা থেকে নামতেই বনলতা পিছন থেকে বলল দিদি?

মুখ ফিরিয়ে দিদি বলল—ও, তুই? ছুটি হয়ে গেল? চারটে বাজে বুঝি? বিনয় বাবুকে পেলাম না, তাঁর খোঁজেই গিছলাম।

সেত বুঝতেই পাচ্ছি। কি দরকারে গিছলে তা আমি জানতে চাইনে। তুমি যে এসে বাবার ওষুধ নিয়ে যাও তা শুনেছি, তবু তার একটা সময় অসময় আছে! এখন বাবা ঘুমুচ্ছেন, ঠাকুমা গেছেন গোপাল-বাড়ী, আমি ইস্কুলে—ডাক্তারের ওষুধ নেবার এই কি সময়? দিদি, মেয়ে মানুষের লজ্জা গেলে আর কিছুই থাকে না।

চঞ্চলা বলল—বুনি, এসব অপমানের কথা, মনে রাখিস্।

দরজায় উঠে ঘাড় ফিরিয়ে বনলতা আগুনের মত একটুখানি হাসলো। বলল—সত্যি? তা হলে অপমান তোমার গায়ে বাজে? আমি জানতাম তোমার একদিক উগ্র হয়ে আর সব দিক ক্ষয়ে গেছে!

এক মুহূর্ত্ত সে চুপ করলো, পরে একেবারে মরিয়া হয়ে নিতান্ত

জঘন্য একটি মন্তব্য করে বসলো। বল্‌ল—পুরুষ মানুষকে তোমার এতখানি দরকার কবে থেকে হয়েছিল তা'ত আর জানিনে ভাই ? বলে বনলতা ভিতরে চলে গেল।

গেল বটে কিন্তু বিনয়ের এ বাড়ীতে আসা বন্ধ করবার মত শক্তি তার শিথিল হয়ে গিয়েছিল। সে প্রায় রোজই আসে— আসে বনলতার মুখেরই ওপর। ঠাকুমার ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে কথা বলে, নিজের জীবনের নানা কাহিনী বলতে বলতে দুঃসাহসের গল্প করে। কর্ত্তার ঘরে গিয়ে ইংরেজি বাঙলায় নানান্ আলোচনা সুরু করে' দেয়।

এ আত্মীয়তার গোপন অর্থ ক্রমশঃ বনলতার কাছে আর গোপন থাকে না।

অনেকদিন পরে কর্ত্তা বিছানার ওপর উঠে বসে' সংবাদ পত্র পড়ছিলেন। শরীরটা তাঁর আজকাল একটু ভালই আছে।

ঘরে ঢুকে একটি ইজি চেয়ারের ওপর বনলতা সোজা হয়ে বসলো। বাবা তার আগমন টের পাননি ভেবে চেয়ারটা একটু শব্দ করে নড়িয়ে সে আবার চুপ করে রইল।

একটু পরে কাগজের ওপর মুখ রেখেই কর্ত্তা বললেন— আজকাল সকালে আর বেড়াতে যাওনা ছোট মা ?

যাই মাঝে মাঝে। আচ্ছা বাবা ?—

কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে তিনি বললেন—কেন ?

দিদির নাকি বিয়ে হবে শুন্‌ছি ? আর পাত্র নাকি আপনার ওই ডাক্তার ?

কর্ত্তা হেসে বললেন—সবই ত জানিস মা ?

বনলতা বলল—শুধু এইটি জানতাম না যে আপনি রাজি আছেন! কারণ আপনি নিশ্চয় জানেন বড় লোকের ছেলে হলে আর ভাল ডাক্তার হলেই সৎপাত্র হয় না!

কথার এই অতিরিক্ত উগ্রতায় কর্ত্তা একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন—বিনয়ের সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি ভাল নয় ?

বনলতা একটুখানি থাম্‌লো, পরে অন্যদিকে চেয়ে হঠাৎ বলল—পাত্রের স্বভাব-চরিত্র ভাল হবে এ দাবী আমরা সবাই নিশ্চয় করতে পারি!

রুগ্ন হলেও কর্ত্তা একটু কঠিন লোক। বললেন—তা পারো, তবে তার একটা অধিকারী-ভেদ আছে। ওজিনিসটা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার চেয়ে, আমি যদি নিজে নাড়াচাড়া করি তা হলেই মানায়—বুঝলে ছোট মা ?

বনলতা বল্‌ল—ভাল লোক কি মন্দ লোক, এ কথা জানবার অধিকারও কি আমার নেই বাবা ?

কর্ত্তা আবার হাসলেন,—সেটা খুব ভাল কথা, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, এ বিয়ে সার্থক! পাত্রের স্বভাব-চরিত্র কেমন সেটা দেখবার চেয়ে চঞ্চলা এবং বিনয়ের মধ্যে গোড়াকার আসল মিলটি যে আছে এই দেখেই আমি আনন্দিত,—বাঙলা দেশে যে বস্তুটি একেবারেই অপরিচিত।

তাতে আপনার ভুলও হতে পারে!—বলে' বনলতা উঠে

দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। অপমানে তিক্ততায় নির্বিষ অবরুদ্ধ আস্ফালনে সে একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিল। তার আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি এই পৃথিবীজোড়া বিরুদ্ধতা ক্ষণে ক্ষণে তার সর্ব্বাঙ্গে যেন শত সহস্র ছুঁচ ফোটাতে লাগলো। পড়বার ঘরের মধ্যে ঢুকছিল কিন্তু চঞ্চলাকে সেখানে বসে থাকতে দেখেই সে অন্যত্র চলে গেল। ঈর্ষা বিদ্বেষ গ্লানি এবং সকলের ওপর চঞ্চলার প্রতি একটা বিজাতীয় হিংসা তার জর্জ্জরিত চোখ-দুটোকে যেন অন্ধ করে দিয়েছিল। চঞ্চলার মুখ পর্য্যন্ত দেখবার ইচ্ছা আর তার নেই। নীচে গেল, কিন্তু পাছে ঠাকুমার সঙ্গে একটা রাগারাগি হয় এজন্য আবার ওপরে উঠে এল। কোথাও যেন শান্তি নেই—বুকের ওপর কে যেন তার অগ্নিদগ্ধ লৌহ দিয়ে খানিকটা পুড়িয়ে দিয়েছে। গোপন করতেও হবে অথচ যাতনারও অন্ত নেই। মাটিতে মাথা ঠুকে ঠুকে আত্মহত্যা করতে পারলে হয়ত খানিকটা স্বস্তি পাওয়া যেত!

রাত্রে দুই বোনে একই ঘরে দুইটি বিছানায় শোয়।

নিঃশব্দে বনলতা বিছানার ওপর পড়েছিল; কয়দিন থেকেই তার চোখে ঘুম নেই, আজও ছিল না। মনে হচ্ছিল বিছানার ওপর কে যেন এক রাশ কাঁকর ছড়িয়ে দিয়ে গেছে—কেবলই ফুটছে। মাথার মধ্যে কানের মধ্যে যেন অবিশ্রাম ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। রাত তখন ঘন গভীর। কেউ কোথাও আর জেগে নেই। এত নীরব যে নিজের মনের কথাগুলি তখন স্পষ্ট নিজের কানেই শুনতে পাওয়া যায়। বনলতা চোখ চেয়ে আস্তে আস্তে

উঠে বসলো। আলোটা তখনও জ্বলছে। মাথার কাছের জানলা দিয়ে শরতকালের মুখচোরা ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। আকাশে মাত্র গুটি কয়েক মিট্‌মিটে তারা—বাদ্‌বাকি সমস্তটাই আসন্ন বৃষ্টির আভাস জানাচ্ছে। দেয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ যেন চারিদিকের নিস্তরঙ্গ নিঃশব্দতাকে অবিশ্রাম বিদ্ধ করে' চলেছে।

আলোটা একটুখানি বাড়িয়ে দিয়ে কি যেন একটা অদ্ভুত খেয়ালের বশে বনলতা ঘরের মধ্যে বার কয়েক পায়চারি করে নিল। ওদিকের বিছানায় চঞ্চলা তখন নিশ্চিন্ত গভীর নিদ্রায় অভিভূত। বোধ করি গরম বোধ হওয়াতে গায়ের কাপড় খুলে দিয়েছে—মাথার খোঁপাও বালিশের ওপর এলিয়ে পড়েছে। বনলতা একবার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। মনে হলো, চঞ্চলা শুধু কালো নয়—কুৎসিৎ! চেহারার মধ্যে এতটুকু শ্রী কোথাও নেই। সর্ব্বাঙ্গে যৌবনের একটি প্রাচুর্য্য আছে বটে কিন্তু এমনতর যৌবন পথে ঘাটে যে কোনো নারীর জীবনেও ত একবার করে' আসে! যৌবনই ত সব নয়—রূপের যে একটি মহৎ আভিজাত্য আছে! চঞ্চলার দৈহিক প্রাচুর্য্যের মধ্যে আত্মতৃপ্তির একটি উদ্দাম পাশবিকতা যেন অতি কষ্টে আত্মগোপন করে' রয়েছে।

ঘৃণায় নাসাকুঞ্চন করে' মুখ ফেরাতেই চোখ পড়লো বড় আয়নাটার ওপর। তাই ত, একি সে! আজকের এই বিশ্বব্যাপী নিবিড় তামসী রাত্রির সে যেন প্রাণ-প্রতিমা নিজের এতখানি রূপ সে ত' কই নিজেও কোনোদিন দেখেনি! কিন্তু মনে হল,

জলন্ত অগ্নিশিখা সদৃশ তার রূপের ওপর দিয়ে যেন একটা মদমত্ত ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। মাথার রুক্ষ বিস্তৃত চুলের রাশি যেন লক্ষ লক্ষ ফণায় কা'কে দংশন করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে ঝুলে পড়েছে। বন-লতা কাছে সরে এল। গায়ের কাপড় সংযত করবার অবসর ছিল না। কাছে এসে দেখলো হিংসার মাধুর্য্য চোখদুটিকে আরো যেন অপরূপ করে' তুলেছে, অধরে একটি তীক্ষ্ণ তিক্ত হাসি—এ হাসি এমনি মধুর যে একে বিদায় দিতেও মন ওঠে না! আর রূপ! সে ত' প্রভাত-সূর্য্যকেও লজ্জা দিতে পারে!

বনলতা আরো কাছে সরে গেল। আপনার অপরিমিত যৌবনের প্রতিবিম্বকে সে যেন কিছুতেই আর এড়াতে পারছিল না। আপাদমস্তক নগ্নতার প্রতি চেয়ে থাকার বাধাও কিছু নেই। মনে হলো, সুকোমল পেলব দুখানি বাহুমূলের পাশে দু'টি উন্নত সুগোল বুকের ওপর বড় বড় দু ফোঁটা রক্ত জমে আছে। তার সমস্ত দেহখানি যেন মানুষের একটি শ্রেষ্ঠ মরণ-শয্যা! অধীর উদ্দাম আবেগে সারা ঘরময় পায়চারি করে' করে' আপনার নিরা-বরণ দেহখানিকে বনলতা দুই হাতে পীড়ন করতে লাগলো।

এত রূপ তার, তবে কেন রূপের প্রতিযোগিতায় চঞ্চলার কাছে সে এমন তুচ্ছ হয়ে গেল? যে অপমান আজ তাকে সইতে হচ্ছে এ ত শুধু তার দেহের প্রতি! যে দেহ বিধাতারও বিস্ময়!

স্ফীতনাসায় বনলতার বিষাক্ত নিশ্বাস পড়ছিল। মেঝের উপর থেকে আস্তে আস্তে পরণের কাপড়খানা সে তুলে' গায়ে জড়াতে লাগলো!

সেদিনের সেই অন্ধকার নিঃশব্দ রাত্রেই; লোকচক্ষুর আড়ালে, —নিতান্ত গোপনে।

দরজা খুলে নিঃশব্দে বনলতা রাস্তায় নেমে এল। পথের ওপর দিয়ে সোঁ সোঁ করে' রাত্রের হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল। গলির মোড়ে টিম্ টিম্ করে' তেলের আলোটা জ্বলছে।

ডাক্তারের দরজায় উঠে সে অতি সন্তর্পণে কড়া নাড়ল। ভিতর থেকে তখুনি সাড়া এল—কে?

খুলুন ত একবার?

তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলেই বিনয় ভয়ানক চম্‌কে উঠ্‌লো। বল্‌ল—একি, আপনি? কি ভাগ্যি আমার? বাবা আপনার ভাল আছেন ত?

বনলতার গলা বন্ধ হয়ে আসছিল। বল্‌ল—হ্যাঁ, আপনি এখনো নীচে রয়েছেন?

আজকাল রাত জেগে একটু পড়াশুনো করতে হচ্ছে, রোজই প্রায় ভোর হয়ে যায়। আপনি এ সময় যে? কি ব্যাপার?

বনলতা মাথা হেঁট করে রইল। বিনয় কিছুই বুঝতে পারল না, নিতান্ত বোকাবুকের মত স্তম্ভিত হয়ে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ বিস্মিত কণ্ঠে বল্‌ল—ওকি, আপনি কাঁদচেন কেন?

অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলে সোজা কথাটাই বনলতা বলে ফেল্‌লো —আমিই ত হেরে গেলাম। তুমি নাকি দিদিকে বিয়ে করবে? সে কি তোমার যোগ্য?

আমার যোগ্য তবে কে?

জানিনে। দিদিকে তোমার বিয়ে করা হবে না। সে তোমার উপযুক্ত নয়।

হতচকিত বিনয়ের মুখের ওপর কথাটা বলেই ফুলতে ফুলতে সে আবার এসে নিজেদের বাড়ীতে ঢুকলো।

গুলবাগ

বাম দিক হইতে দূর দক্ষিণান্ত অবধি নিবিড় বন রেখা; একে-বারে সেই পরগণার শেষ পর্যন্ত। নাম বলে—গুলবাগ।

মাঝামাঝি খানিকটা জলা,—আদি-অন্তহীন। কেউ বলে নদী, কেউ—তড়াগ। নোনা জল; সমুদ্রের সঙ্গে নাকি যোগ আছে। নাম—ঝরোকা। ধারে ধারে কতকগুলি জেলে-কুটীর; মাছের কারবার চলে। জলের উপর পানকৌড়ি চরে; গলা বাড়াইয়া ডুব দেয় আর সেই সেখানে গিয়া ভাসিয়া ওঠে। পাড়ের ধারে বকের পাল ওৎ পাতিয়া বসে; মাছ-রাঙার ঝাঁক্ উড়িয়া বেড়ায়; আর সেই যে সেই লেজ নাচায় যে পাখী—কালো কালো ......তাহাদেরই দঙ্গল।

বনের ওপারে সঙ্কীর্ণ রেল-পথের যাত্রীরা এইদিক দিয়া পার হইবার সময় দেখে, বড় বড় গাছগুলি কোমর ভাঙ্গিয়া হেঁট হইয়া তাহাদের অভিবাদন করে।

গাছগুলো অমনিই। সমুদ্রের অবিশ্রান্ত হাওয়া লাগিয়া তাহারা উপর দিকে আর বাড়িতে পায় নাই। কোমর বাঁকাইয়া হেলাইয়া সুমুখের দিকে আপনাদের ডাল-পালা ছড়াইয়া দিয়াছে। পাখীদের গানে কূজনে কাকলীতে বন হইতে বনান্তের ঘন গম্ভীরতা দিনরাত মুখর হইয়া থাকে।—

সম্প্রতি মাস কয়েক হইতে ঝরোকার ওপারে গুলবাগের বন ঘেঁসিয়া তাঁবু পড়িতেছিল। ইতিমধ্যে দুতিনখানি বাঙলো উঠিয়াছে।

সরকার-তরফ হইতে ঔষধি-বন কাটিবার খৎনামা পাওয়া গেছে। কল বসিয়াছে, যন্ত্রপাতি আসিয়াছে, অফিস বসিয়াছে, —কুলি-মজুরের গোলমাল ত আছেই।

চন্দনা বলে—ছি ছি! কি না কি—মাথা আর মুণ্ডু; গাছ-পালার ওপর অত্যাচার! রস নিংড়ে নিংড়ে একেবারে তাদের ......আমার বাবাও কম যান্ না।

কাকে বলে—আর কে শোনে!

বুটুক বলে—তোমার কথায় ত হবে না, চন্দনা!

পিছন ফিরিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া চন্দনা বলে—তুমিও ত ওই দলে? চিরকাল শুধু গাছ কেটেছ আর ঘোড়ায় চড়েছ। আর কি করেছ শুনি, যে ঝগড়া কর্ত্তে আস' বার বার আমার সঙ্গে? জংলী কোথাকার!

তিরস্কারের সে এক অপরূপ মাধুর্য্য! হাসিমুখে বুটুক বলে—বন কাটা না হলে তোমার দেখা পেতাম কোথায়?

চন্দনা এ-যুক্তি এড়াইয়া চলে। মুখে বলিতে থাকে—কেউ গাছপালা কাটচে, কেউ মাছ মারচে, কেউ-বা পশুপাখী,—এর মধ্যে আমার থাকতে একটুও ভাল লাগে না। যেদিকেই চাই কেবল···হত্যেকাণ্ড নয় ত কি?

জলের ধারে দাঁড়াইয়া দুজনের কথা হয়।

বসন্তের তখন শেষ। গাছে গাছে তখন রঙ—পাতায় পাতায় তখন জীবনের রোমাঞ্চ আবেগ! তাহাদের ভিতর হইতে কোকিলের শীর্ণ দীর্ঘ কণ্ঠস্বরের আর বিরাম নাই। দেবদারু-বনে সবুজ-সমারোহের তখন পরিপূর্ণ সমারোহ। ভ্রমর, মৌমাছি আর ঝিঁঝির গুঞ্জনে শিশু-বনের যেমন সৌন্দর্য্য—তেমনি চঞ্চলতা।

বুটুরুর হাত ধরিয়া চন্দনা সেদিকে তাকাইয়া বলে—আচ্ছা, তোমার এসব ভাল লাগে?—এই যে গাছ কাটাকাটি আর······

জীবনের প্রায় পঁচিশটি বছর যাহার এই নির্জ্জন অরণ্যে কাটিয়াছে, তাহার নিকট হইতে ইহার কোন উত্তরই আসে না।

এ থাকে তাঁবুতে—আর ও থাকে বাঙলোয় ডাক্তার নানুহোরির কাছে। ডাক্তারের ওই একটিই মেয়ে। উনি এসেছিলেন ঔষধি-বন পরিদর্শনের কাজে।

মেয়ের কিন্তু বাঙ্লোয় মন টেঁকে না। সারাদিন সারাবেলা তাহার বাহিরে বাহিরেই কাটে।

বুটুরুও তাই। কিন্তু তার সঙ্গে থাকে ঘোড়া। ঘোড়ায় চড়িয়া সে ঝরোকার পাড়ে পাড়ে তীরবেগে ছুটিয়া বেড়ায়। জলে তাহার ছায়া পড়িতে থাকে।

চেঁচাইতে চেঁচাইতে চন্দনা খানিকদূর তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া যায়—পড়বে, পড়বে—যাবে কোন্‌দিন মাথাটি গুঁড়িয়ে ঘোড়ার পায়ের তলায়।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! ঘোড়ার পিঠের উপর হইতে হাসিতে হাসিতে বুটরু বহুদূরে চলিয়া যায়। ঘোড়াটা যেন পক্ষীরাজ!

বনের মধ্যে রাস্তা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে; আর বেশী দূর যাইতে চন্দনার সাহস হয় না।

ঘোড়া লইয়া বুটরু যখন ফেরে, দেখে—জলের ধারে চুপ করিয়া চন্দনা বসিয়া আছে।

কাছে গিয়া হেঁট হইয়া সে বলে—রাগ করলে নাকি?

চন্দনা কথা কয় না।

বুটরু নিতান্ত বন্যপ্রকৃতির। মান-অভিমানের পালা-গাওয়া তাহার আসে না। চট্ করিয়া দুই হাতে চন্দনাকে তুলিয়া সে ঘোড়ার পিঠের উপর বসাইয়া দেয়।

ছাড়ো ছাড়ো, আঃ—ওকি, পড়ে যাবো যে!

কিন্তু দুষ্ট ঘোড়াটা কথা বলিবার এতটুকু অবসর না দিয়াই চলিতে সুরু করে। চন্দনা ভয়ে ঘোড়ার ঘাড়ের চুলগুলি দুই হাতের মুঠায় শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকে।

হাততালি দিয়া বুটরু সঙ্গে সঙ্গে যায়—রাগ করবে আর? বল, এবার থেকে আমার কথা শুনবে? আমি ডাকলে আর লুকিয়ে থাকবে না, বল?

চন্দনা রাগে পড়িয়া তাহার সকল কথায় রাজি হয়। ছুটিতে ছুটিতে গিয়া বুটরু তখন ঘোড়ার লাগাম ধরে।

এসো নামো—হাত ধরচি।

হাত ধরলে নামা যায় কখনো এত উঁচু পিঠের ওপর থেকে?

দুজনেই একটু বিপদে পড়ে। লজ্জায় চন্দনা চারিদিকে একবার তাকায়। বুটরু কিন্তু তার লজ্জার কারণ বুঝিতে পারে না। সে বলে—নামবে ত নামো? দেখছ কি এদিক ওদিক?

নিরুপায় হইয়া চন্দনা তখন মাথা হেলাইয়া দুই হাতে বুটরুর গলা ধরিয়া কাঁধে ঝুলিয়া মাটিতে নামিয়া পড়ে।

লজ্জায় রাগ দুঃখে তখন তাহার কান্না পায়।

আবার একদিন হয়ত—

হয় ত বুটরু তাহার মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকে। সে দৃষ্টিতে না আছে ভাষা—না আছে তন্ময়তা!

চন্দনা বলে—কি? দেখছ কি অমন করে? স্ত্রীলোক দেখ নি বুঝি জীবনে?

সত্যই ত তাই। দেখিয়াছিল সেই বাল্যকালে দেশে থাকিতে। তারপর অরণ্যের এই দীর্ঘ নির্ব্বাসনের মধ্যে……

বুটরু চুপ করিয়া অন্যদিকে চলিয়া যায়।

চন্দনা ঘরে থাকিতে পারে না। বাপের অবাধ্য মেয়ে। বুড়া বাপ প্রবীণ ডাক্তার—অতএব মেয়ের সম্বন্ধে তার উদাসীন!

বুটরু ডেপুটি রেঞ্জার। সকালে ঘোড়ায় চড়িয়া কাজে যায়। মাঝে খাবার ছুটি। প্রখর রৌদ্রে ঘোড়ায় চড়িয়া ধূলা উড়াইয়া

যখন সে বনপথ দিয়া ছুটিতে ছুটিতে আসে—চন্দনা তাহার সেই আসিবার পথে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে,—অভিনন্দন দিবার জন্য।

গল্পে কথায় হাসিতে পথ মুখর করিয়া দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া ফিরিয়া আসে।

যেদিন চন্দনা দাঁড়ায় না—বুট্কুর পা সেদিন ভারি হইয়া ওঠে। স্নানাহারে তাহার আর রুচি থাকে না। এদিক ওদিক খোঁজ করিতে করিতে অনেক দূর চলিয়া আসে। জেলেদের মেয়ে-গুলার সঙ্গে চন্দনা প্রায়ই খেলিয়া বেড়ায়—এ খবর সে জানে।

হয়ত শেষকালে দেখিতে পায়, একখানি পরিত্যক্ত জেলে-কুটীরের মধ্যে ঠাণ্ডা মাটির উপর রৌদ্রের তাত বাঁচাইয়া চন্দনা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

বুট্কু গিয়া কাছে বসে। নিদ্রিত চন্দনাকে স্পর্শ করিতে তাহার সাহস হয় না।

বাহিরে বকের ডানার ঝপ্ ঝপ্ শব্দ হয়; নির্জ্জন রৌদ্রবেলার নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া দূর অরণ্য হইতে পাখীর কলকণ্ঠ শোনা যায়।

কম্পিত ভীরু হস্তে সে চন্দনার দুতিন গাছি মাথার চুল নাড়া-চাড়া করে, নিদ্রিত অবস্থায় মেয়েটির গায়ের আঁচলের কোন বাধ্য-বাধকতা থাকে না,—বুট্কু সেই সুগোল সুন্দর একখানি হাতে একটি আঙুল স্পর্শ করিয়া অনুভব করে।

উষ্ণ-উত্তপ্ত নারীর গা!

মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে—নিদ্রিত মুখখানির উপর হইতে দুষ্টামির হাসি তখনও মিলায় নাই।

হঠাৎ নিজের কাপুরুষতার লজ্জায় সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসে। তাহার দেহে যেন আর ক্লান্তি থাকে না। ঘোড়াটার পিঠের উপর লাফাইয়া উঠিয়া কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নিজের তাঁবুর দিকে অদৃশ্য হইয়া যায়।

এমন কতদিন গেছে!

বৈকালে ঝরোকায় স্নান করা এবং সাঁতার কাটা,—সে এক উপভোগ্য ব্যাপার। জেলে-কুটীর হইতে স্ত্রী-পুরুষেরা আসে, কুলি-কামিনরা আসে, বাঙলো হইতে দেশী সাহেবরা আসে,—বুটরুও আসে।

দুই তিন ঘণ্টা কাল সকলে মিলিয়া জলে মাতামাতি করে।

ছুটিতে ছুটিতে চন্দনা আসিয়া হাজির।

তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। বুটরু গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। চন্দনা আসিয়া বলিল—আবার জলে নেমেছ? ক'দিন থেকে জ্বর হয়েছে না তোমার?…খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হলাম যে?

বুটরু বলিল—খুঁজছিলে কেন?

চন্দনার সমস্ত মুখ সমস্ত ভঙ্গী তখন খুসিতে ভরিয়া উঠিয়াছে; জলের পাতার কাছে আসিয়া বলিল—কথা আছে। সরে এস, বল্‌চি।

বুটরু সরিয়া গেল। হাসিয়া থামিয়া হাঁপাইয়া ভূমিকা করি চন্দনা কি যে বলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল তাহা বুটরুর মাথা ঢুকিতেছিল না।

হঠাৎ ডান হাতটা বাড়াইয়া সে চন্দনার একটা হাত ধরিয়া ফেলিল এবং কোনও কথা বলিবার অবসর না দিয়া একেবারে জলের মধ্যে টানিয়া আনিল।

হতভম্ব হইয়া চন্দনা বলিল—এ কি কল্লে?

বুটরু একবার তাহাকে জলে ডুবাইয়া আবার তুলিল। পরে বলিল—ঠাণ্ডা হও একটু, ছুটতে ছুটতে যে রকম...দেবো, দেবো ডুবিয়ে ওইখানে?

ভয়ে চেঁচাইয়া চন্দনা তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিল।

জলের মধ্যে তাহাদের মাতামাতি চলিল অনেকক্ষণ। চন্দনা কহিল—জর যদি তোমার বাড়ে? তবে?

বুটরু বলিল—বল না কি বলছিলে?

কি ভাবিয়া চন্দনা বলিল—শুনে তোমার রাগ হবে না?... আঃ ওকি, যাও—ওসব আমি......হাত দিয়া বুটরুর মুখখানা সরাইয়া দিয়া চন্দনা বলিল—দলুয়া এসেছে যে!

দলুয়া কে?

দেখ নি বুঝি তাকে? আমার জ্ঞাতি ভাই।......আবার? যাই তবে আমি—চললাম।

হাত ছাড়াইয়া সে উপরে উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভিজা কাপড়ে সকলের সুমুখে উঠিতে তাহার ভারি লজ্জা করিতে

লাগিল। মুখ ফিরাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—আগে তুমি ওঠো।

শান্ত ছেলেটির মত বুটরু উপরে উঠিল। আঙুল দেখাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া চন্দনা বলিল—পেছন দিকে চেওনা কিন্তু। আমি ঠিক যাবো তোমার পেছনে পেছনে—বুঝলে?

বুটরু গা-মাথা মুছিয়া কাপড় ছাড়িয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। চন্দনা তাহার ভিজা কাপড়খানি কোনোরূপে গায়ে টানিয়া টানিয়া পিছু পিছু চলিল।

আগে চলিতে চলিতে বুটরু একটি করিয়া কথা বলিবার চেষ্টা করে আর চন্দনা শাসায়—পিছন দিকে মুখ ফিরিয়েছ কি আর কথা কইব না তোমার সঙ্গে।

এমনি করিয়া সারা পথ আসিয়া হঠাৎ এক সময় পিছন দিক হইতে বুটরুর গায়ে একটি টিপ্ দিয়া চন্দনা বলিল—বোকা!

বলিয়া ছুটিতে ছুটিতে তাদের বাঙলোর বারান্দায় গিয়া উঠিল।

বুড়া নানুহোরি তখন সবে মাত্র আলো জ্বালিয়া ডাক্তারী বই লইয়া বসিয়াছিলেন; মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন—ওকি, জল কেন গায়ে?

চন্দনা বলিল—নেয়ে এলাম।

একা?

একাই ত যাই আসি রোজ।

মাথা চুলকাইয়া ডাক্তার বলিলেন—বুট্‌রুকে সঙ্গে নিলেই হত! সাঁতার জানে ভাল আর জোয়ান! সহজে ডুববে না।

তারপর নিজেই তিনি বিজ বিজ করিয়া বকিতে লাগিলেন, লোণা জলে স্নান করা ভাল, চর্ম্মরোগ ধরে না,—শরীর সুস্থ থাকে ইত্যাদি।

বুট্‌রু অনেকক্ষণ একা সেই পথের উপর দাঁড়াইয়া এইবার চলিতে লাগিল। মাথাটা ভার বোধ হইতেছিল। জ্বরের উপর স্নান না করিলেই ভাল হইত।

দলুয়া!

সত্য হোক মিথ্যা হোক—অপবাদের গুরুভার এমনি করিয়াই চিরদিন কাঁধে লইয়া বেড়াইতে হইয়াছে। প্রতিদিনের জীবন-যাত্রায় সে ভার বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। তা হোক—নিজের প্রতি অকারণ অনুগ্রহ করিয়া সে অনুশোচনাকেও প্রশ্রয় দেয় নাই কোনদিন!

জীবনের আঠারোটি বছর সে কেবল অন্যায়ের জন্য অনাদরই পাইয়া আসিয়াছে, পাপের জন্য শাস্তি পাইয়াছে, হীনতার জন্য নির্য্যাতনই ভোগ করিয়াছে। নৈলে রাজার মত যেখানে আশ্রয় পায়,—কুকুরের মত সেখান হইতে আবার বিতাড়িতই বা হয় কেন!

আশ্রয় পাইবার কারণ আছে।

দেবতার মত যৌবন,—অকলঙ্ক! উজ্জ্বল ছটি চোখ,—মানুষের কাছে নত হয় না, ভিক্ষাও করে না,—বরং দাবী জানায়।

ভিড়ের মধ্যে নিজেকে সুস্পষ্ট করিয়া তোলে।

কিন্তু পৃথিবীর সকল দরজা তাহার মুখের উপর বন্ধ হইয়া গেছে।

নাম—দলুয়া! দূতী-পাখীর মত যেখানে সেখানে সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। খবর পাইয়া এবার নানুহোরির কাছে আসিয়াছে।

চন্দনা তাহাকে দেখিয়াছিল বহুকাল আগে; সেই ছোট বেলায়। এখন দেখিয়া সে লজ্জায় সুমুখে বাহির হইতে পারে না। আড়াল হইতে লুকাইয়া দেখে।

মাঝে মাঝে চোখচোখি হয়। নানুহোরি তখন হয়ত কাজে ব্যস্ত আছেন। দলুয়া সরিয়া গিয়া বলে—নাম কি? চন্দনা?—বেশ নাম!—এস না ভাই, কথা কই দুজনে।—বলিয়া সে চন্দনার হাত ধরিতে যায় কিন্তু চন্দনা দূরে সরিয়া দাঁড়ায়।

হাত ধরিতে আর এমন কি দোষ!

দলুয়া কিন্তু আর গ্রাহ্যও করে না। ঘরের দামি আসবাবগুলির দিকে সে তখন লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায়। বলে—বাঃ ঘড়িট ত বেশ! অনেক টাকা দাম হবে!…পয়সা-কড়ি থাকে বুঝি ওই বাক্সটার মধ্যে?

এমনি করিয়া নিজের মধ্যেই সে নানান্ প্রশ্ন করে আর চারিদিকে তাকাইয়া মনে মনেই সকল বস্তুর মূল্য নির্দ্ধারণ করে।

বলে—এঃ ফুলের তোড়া এখানে রেখে কি হবে, এক পয়সাও দাম নয়, কেবল জঞ্জাল!—ঠাকুরের বেশ ছোট্ট মূর্ত্তিটি ত! সোনার কি পেতলের কে জানে! ওগুলো কি রূপোর থালা-বাসন—না আলুমিনির? তা সে যাই হোক, আমার কি!

মুখ ফিরাইয়া দেখে, ছোট জানালার ভিতর দিয়া চন্দনা তাহার প্রতি চাহিয়া আছে।

হঠাৎ বলে—কাণে তোমার ও দুটো বেশ চক্‌চক্ কচ্ছে ত? দুল্ বলে ওকে—না? কিসের তৈরী দেখি?

চন্দনা কিন্তু কাছ ঘেঁষে না। বলে—হীরের।

বলিয়া চলিয়া যায়।

হীরে!—দলুয়ার সমস্ত মাথার ভিতর কথাটা গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়।

চন্দনা খানিকটা দমিয়া গেল। আলাপ করিবার, গল্প করিবার প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও কি যেন একটা বাধা আড়াল করিয়া দাঁড়াইল।

দলুয়া কোথা দিয়া আসে আর কোথা দিয়াই বা যায়। তাহার প্রবেশ ও প্রস্থান সকলের নজর এড়াইয়া চলে। ওইটুকু তাহার গোপন।

আসে যখন,—চন্দনা দেখে, কখনও ডেস্ক খুলিয়া এটা-ওটা নাড়াচাড়া করে, আলমারির ডালা খুলিয়া প্রত্যেকটি বস্তুর প্রতি লোভীর মত তাকায়, দামি জামা-কাপড়গুলিতে হাত বুলাইয়া আস্বাদন করে।

যে সব বস্তুর বাস্তব-মূল্য কিছু আছে, তাহাতেই তাহার আগ্রহ। রক্ত-মাংসের মানুষ তাহার কাছে নিতান্ত তুচ্ছ।

তাই চন্দনার সঙ্গে যখনই মুখোমুখি হয়, দলুয়া তাহার আপাদ-মস্তকের মধ্যে শুধু দেখে—কাণে হীরার দুল, গলায় সরু একগাছি সোনার হার, দুহাতে দুগাছি সোনার চুড়ি, বাঁ হাতের কচি আঙুলটিতে নীলার একটি আংটি।

আর চন্দনা আড়াল হইতে দেখে—দলুয়ার অকলঙ্ক যৌবন-শ্রীর অন্তরে কলঙ্কের স্পষ্ট রেখা!

বুড়া নানুহোরির টাঙা-গাড়ি বাঙলোর গেটের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। দলুয়া সুট্ করিয়া অন্যপথ দিয়া বাহির হইয়া যায়। কেন যে অমন করিয়া পালায়, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। হয় ত সে নিজেও না।

বুড়া সুমুখে কন্যাকে দেখিয়াই বলেন—ভাল আছ বেশ? এর মধ্যে অসুখ বিসুখ……খাওয়া হয়েছে,—আহার?

কন্যা রাগিয়া বলে—আমাকে দেখলেই কি ও-ছাড়া আপনার আর কথা নেই বাবা?

বুড়ার মাথায় সাদা তুলার মত চুল। মাথাটি নাড়িয়া বলেন—তাই বলছি, বেশ পেট ভরেছে ত?…যাওনি? বেড়াতে বেরোও নি আজ?…বুটরু গিয়েছিল আজ আমার কাছে, জ্বর বেড়েছে তার। বেচারা!

তাঁহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া চন্দনা চুপ করিয়া থাকে। কন্যাকে সন্তুষ্ট করা গেল না ভাবিয়া বাপ পুনরায় বলেন—

বেশ, ভারি হাল্কা ছেলে দলুয়া……কোথাও গোলমাল নেই, বেড়ালের মত পা……খায় ত? [illegible] বেশ খেতে পায় ত!

চন্দনা বলে—জানি না কো।

তাই বলছি,—জামা ছাড়িয়া জুতা [illegible] নান্‌হোরি আবার বলেন—পেট ভরে নিশ্চয় খায় নৈলে চেহারা অমন…দেখেছিলাম জয়পুরের রাজকুমারকে, আর এই দেখলাম দলুয়াকে। বাঃ!

চন্দনা নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া যায়। কি জানি কেন তাহার চোখে জল আসে।

কদিন যায়,—চন্দনার আর দেখা মেলে না।

ডাক্তারের বাঙ্‌লো খানিকটা দূরে; জ্বর এবং বুকে পিঠে ব্যথা লইয়া বুটরু সেখানে যাইতে পারে না।

জ্বর বাড়িয়াছে,—বুনো জ্বর।

ঝরোকার দিকে খানিকটা রাস্তা গিয়া বুটরু একদিন খুঁজিয়া আসিয়াছিল কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পায় নাই।

তাঁবুর পাশেই একটা প্রকাণ্ড গাছের ডালে ছায়ার মধ্যে ঘোড়াটা দড়ি দিয়া বাঁধা থাকে। খট্ খট্ করিয়া তাহার পায়ের শব্দ হয় আর নাকের শব্দ করিয়া জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে।

সময়ে তাহাকে কে খাইতে দেয় তাহার ঠিক নাই।

একা ঘরের মধ্যে চোখ বুজিয়া বুটরু পড়িয়া [illegible]। সংসারে এমন কেহ তাহার নাই যাহাকে রোগ-শয্যায় [illegible] খবর দিবামাত্র ছুটিয়া আসে।

চন্দনা এত কাছের কিন্তু সেও একবার দেখা দেয় না।

জ্বর হয়ত একটুখানি কমিলে বুটরু চোখ খুলিয়া তাকায়। গরমের দিনে গায়ে এক রাশ জামা কাপড়! ঘরের সমস্ত জানালাগুলি কতদিন হইতে বন্ধ,—কে যে খোলে তা'র ঠিক নাই। চারিদিকের দেয়ালে দুতিনটা বন্দুক, ছোরা-ছুরি, একখানা তলোয়ার, একটা বর্শা, যেন তাহাদের অধিকারীর নিদারুণ পরিচয় লইয়া ঝুলিতে থাকে। ঘরময় ডিমের খোলা, পাউরুটির টুকরা, পোড়া সিগারেট, দেশালাইর কাঠি, লেবুর খোসা,—এইসব ছড়ানো। কয়েকদিন পূর্ব্বে একটা ঘুঘুপাখী শিকার করা হইয়াছিল,—ঘরের এক কোণে সেটা রক্তাক্ত অবস্থায় এখনও মরা পড়িয়া আছে। তাহাতে যেমন পিঁপড়া—তেমনি মাছি ; বোধ করি পচ্ ধরিয়াছে।

গোয়ালাদের একটি মেয়ে রোজ সকালে দুধ দিতে আসে। তাঁবুর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া হাতের ঘটি বাড়াইয়া বলে—'পালো'।

বুটরু উঠিবার চেষ্টা করিয়া বলে—কি দুধ ? দাও—ওই প্যান্টাতে ঢেলে দিয়ে যাও ?

আলুমিনির একটা বাসনে দুধ ঢালিতে গিয়া মেয়েটি দেখে, আগের দিনের বাসি দুধ এখনও খরচ হয় নাই।

ওঃ রয়েছে বুঝি কাল্‌কের দুধটা ? খাই নি বটে, কে আর গরম করে' দেয়? উঠ্‌তে আমার বড় কষ্ট হয়!

মেয়েটি বোকার মত একবার তাকায়। তারপর একটা গেলাস টানিয়া তাহাতে দুধটুকু ঢালিয়া দিয়া হাত পাতে।

পয়সা চাই নাকি?—বিছানার পাশে একটা কাঠের বাক্স দেখাইয়া বুট্রু বলে—নাও, ওইতে আছে।

বাক্স খুলিয়া কয়েকটি পয়সা মেয়েটি গণিয়া গণিয়া লয়, তারপর আবার সেটি বন্ধ করিয়া পয়সা কয়টি বুট্রুকে দেখায়।

হাত নাড়িয়া বুট্রু বলে—আরে দেখাতে হবে না আর ভাই। মেয়েমানুষ তোমরা ঠকাবে—না লুকিয়ে বেশি নেবে? বেশ যা হোক!

মেয়েটি চলিয়া যায় দেখিয়া বুট্রু আবার বলে—যাচ্ছ? শোন' শোন'—আচ্ছা, খুব সুন্দর একটি মেয়েকে দেখতে পাও? চন্দনা? দেখতে পেলে বলো ত একবার,—তোমার বোকা-বন্ধুটি একবার তোমায় দেখতে চায়।—বলবে ত? অসুখ করেছে তা যেন বলো না—ভাববে;...মনে থাকবে আমার কথাটি?

মেয়েটা হাঁ করিয়া একবার ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া বাহির হইয়া যায়। বুট্রুর কথা বা ভাষা সে কিছুই বোঝে না।

একাকিত্বের এক একটি মুহূর্ত্ত জ্বরের যন্ত্রণায়, ব্যথায়, হতাশায় বুট্রুর নিকট অত্যন্ত কঠিন হইয়া ওঠে। তাহার সমস্ত মন সমস্ত প্রাণ একটি চঞ্চল পদধ্বনির আশায় বাহিরের দিকে আকুল হইয়া থাকে।

অতিকষ্টে ধরিয়া ধরিয়া কোনরূপে সে তাঁবুর বাহিরে আসিয়া বসে। অদূরে রাস্তা দিয়া লোক জন যায়, গাড়ী ঘোড়া যায়—কুলি-কামিনরা দিনের কাজ সারিয়া স্নান করিতে ঝোরার পথে যায়।

ওহে, শোন' শোন'—একটি কথা শুনে যাও? ···চল্‌লে? যাও!

আর তুমি? ওহে ফেট্টি-বাঁধা, 'রোজ' শেষ হয়ে গেল তোমার? বলি, কাজ কর্ম্ম বেশ চল্‌চে—না? আচ্ছা, ডাক্তার সাহেব আমার নাম করে না?

···দেখেছ? একটি দুষ্ট মেয়ে খেলিয়ে বেড়ায়? ভারি চমৎকার মেয়ে। এতদিন আসতে পারিনি বলে লজ্জায় এখনও আসতে পারচে না। দেখেছ আমাদের চন্দনাকে?···চল্‌লে?

উদ্দিষ্ট পথিকেরা নিঃশব্দে চলিয়া যায়।

অদূরে রাস্তা দিয়া কতকগুলি জেলেদের মেয়ে গলা ধরাধরি করিয়া পার হইয়া যাইতেছিল।

ওগো লক্ষ্মী, বলি এসই না এদিকে একবার? দেখ, সত্যি বলছি, তোমার নাকটি আর ওই ওর চোখ দুটি···এই ধর কতকটা চন্দনার মতো।···আচ্ছা দেখলে, ডাক্তারের সেই সুন্দর মেয়েটিকে দেখলে কারু সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে?

···শাড়ি খানি পরে' তোমাকে ভারি চমৎকার মানিয়েছে··· বল না, দেখলে?

মেয়েগুলা হাসিয়া লুটাইতে লুটাইতে চলিয়া যায়। তাহার কথা কেহই বুঝিতে পারে নাই।

গাছের সঙ্গে বাঁধা ঘোড়াটা পাশে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন মাথা নাড়িতে থাকে। দড়ি খুলিয়া ছুটিয়া তাহার কাছে আসিতে চায়। গলার ঘুঙুরগুলি তাহার ঝুম ঝুম করিয়া বাজিতে থাকে। তাহাকে খাইতে দিবার লোক নাই।

ষাট টাকা দামের আদরের ঘোড়া!

ও ভাই, একটি কথা শুনবে?

কি?—বলিয়া ছোকরাটি কাছে আসিয়া দাঁড়ায়।

একটি পথিকও যে তাহার কথা শুনিয়াছে, এই আনন্দে হঠাৎ বুট্‌রুর গলা ধরিয়া আসে। বলে—রাজবাড়ী এখান থেকে কদ্দুর ভাই?

তা ত জানি না।

জান না? মনে করেছিলাম, তুমি তাদেরই ছেলে!

ছোকরাটির অপরূপ রূপের প্রতি বুট্‌রু কিয়ংক্ষণ তাকাইয়া থাকে।

তাঁবুর ভিতরে এদিক ওদিক্ ছোকরাটি তাকায়,—একান্ত কৌতুহলে। পরে আরও কাছে আসিয়া, ঘরের সমস্ত কিছুর প্রতি নজর চলে এমনি ভাবে বসিয়া বলে—অসুখ করেছে বুঝি তোমার?

হুঁ—বুটরু বলে। বলিয়া হঠাৎ ছেলেটির গায়ে তাহার জরোত্তপ্ত কর্কশ একখানি হাত রাখিয়া বলে—এত রূপ তোমার?

ছেলেটি তাহার কথায় ভ্রুক্ষেপ করে না। বলে—বাইরে বসে ঠাণ্ডা লাগবে না? চল, ভিতরে শুইয়ে দিই গে।......এদেশে চাকরী কর বুঝি তুমি?...চল।

যত্ন করিয়া সে বুট্‌রুকে তোলে, তারপর ধরিয়া ধরিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া গিয়া ভাল করিয়া বিছানা পাতিয়া শোয়ায়। তাঁবুর বোতাম-টেপা দু-একটা জানালা খুলিয়া দেয়। পরে জল গরম

করিয়া তোয়ালে দিয়া বুটুকুর মুখ-মাথা মুছাইয়া দিয়া দুধ গরম করিয়া খাওয়ায়।

এত অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি পরিচয়···বুটকু অবাক্ হইয়া বার বার তাহার মুখের দিকে তাকায়।

ছেলেটি এদিক ওদিক চায় আর বলে—বেশ ঘরখানি তোমার।...এত জিনিস-পত্তর? ওগুলো সোনার মেডেল্ ঝুল্‌চে—না?

হ্যাঁ ভাই, প্রাইজ পেয়েছিলাম।

ও। আর ওই রূপোর সাজগুলোও বুঝি...অস্ত্রগুলোর অনেক দাম হবে—না? বা রে, সোনার ঘড়িও যে আবার চেন্ শুদ্ধু।···এতগুলো সোনার বোতাম সব তোমার?

রোগ-শয্যার সেবা বুটকু কোনদিন পায় নাই। আনন্দে স্বস্তিতে, কৃতজ্ঞতায় তাহার চোখ দুটি বুজিয়া আসে।

চোখ বুজিয়া বুজিয়া বলে—ডাক্তারের মেয়েটিকে দেখলে?

ছোক্‌রাটি বলে—কে?

ওই আমাদের চন্দনাকে? ঘুরে বেড়াচ্ছে বুঝি সেই দলুয়া না কে—সেই ছেলেটার সঙ্গে?...এমন শয়তান ছেলেটা, একবার আসতে দেয় না? নৈলে আমায় না দেখে এতদিন সে—?

ছোক্‌রাটি তাহার মুখের দিকে তাকায়।

পাশ ফিরিয়া বুটকু শুইয়া থাকে।

খানিকক্ষণ চুপ-চাপ।

তেমনি ভাবে শুইয়াই সে বলে—ডাক্তারের বাঙলাটা চেনো ভাই, একবার একটি খবর দিও তো চন্দনাকে?...অনেক কষ্ট

দিলাম ভাই, কিছু মনে করো না।...আর ওই ঘোড়াটাকে চারট দানা আর একটু জল...বেচারা ভারি কষ্ট পাচ্ছে।

চোখ বুজিয়া বুটরু হাঁপাইতে লাগিল। তাঁবুর ভিতরে ছোক্‌-রাটি এদিক ওদিক খানিকক্ষণ নিঃশব্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

বুটরু ওদিক ফিরিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

ছেলেটি তাহার অলক্ষ্যে এতটুকু সাড়া না দিয়া বাহির হইয়া গেল। ঘোড়াটাকে দানা-পানি দিল কি না কে জানে!

আলাপ ত আছেই; একটু একটু করিয়া ঘনিষ্ঠতা হয়।

দলুয়া বলে—কাঠের ব্যবসা এদেশে করলে বেশ টাকাকড়ি হয়। বন থেকে গাছ কাটো আর রেল-কোম্পানীতে চালান দাও...নয় ত কাঠের জিনিস-পত্তর তৈরী করে দিব্যি দেশ-বিদেশে পাঠাতে থাকো,—পয়সা তখন খায় কে? কি বল?

চন্দনা কোনও কথা কয় না,—উদাসীন ভাবে একদিকে দাঁড়াইয়া থাকে। সম্প্রতি জেলেদের পাড়া হইতে দলুয়ার সম্বন্ধে কি একটা দুর্নাম তাহার কানে আসিয়াছিল।

তাহাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে দলুয়া কি সব কতকগুলো জিনিস লুকাইয়া রাখিতে থাকে। তারপর তাহাতে চাবি বন্ধ করিয়া বলে—লুকিয়ে লুকিয়ে আমায় অনেকে দেখে আমি বুঝতে পারি। আমি কি এতই ভাল দেখতে?

পরে হঠাৎ বলে—চন্দনা! বেশ নামটি। বেশী করে গয়না

পর না কেন? তোমাকে ত বেশ ভালই মানায়...যেও না, যেও না,—শোন', কথা আছে; তোমাকে যে ডাকছিল।

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চন্দনা বলে—কে?

ওই ত,—ভাগ্যি বললাম! ডাকছিল সেই লোকটি। সেই যে সেই তাঁবুতে থাকে...ভারি অসুখ তার।

তুমি জানলে কি করে'?

দলুয়া হঠাৎ সেই বন্ধ বাক্সটির দিকে একবার তাকাইয়া বলে—তার তাঁবুতে গিছলাম যে!

কঠিন মুখে চুপ করিয়া চন্দনা চলিয়া যায়। দলুয়া বলে—বেশ, রাগলে তোমার মুখখানি বেশ দেখায়।

খালি গায়ে দলুয়া যখন খাইতে বসে, চন্দনা আড়ালে চলিয়া যায়। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না,—নানা ছুতায় মাঝে মাঝে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে। দলুয়া হাসিয়া বলে—বসো না ওই-খানে?—এত যত্ন করে' আমায় কেউ খেতে দেয় না।

কিন্তু চন্দনা বসে না,—ভিতরে গিয়া দরজার ফুটা দিয়া তাহার প্রতি চাহিয়া থাকে।

চুরি করিয়া দেখার মতই রূপ! মাথায় রেশমের গোছার মত একমাথা ঢেউ-খেলানো চুল, কালো কালো জোড়া ভুরুর তলায় টানা টানা ছুটি চোখ, দুধে-আলতার মত দুটি গাল; লাল দুটি পাতলা ঠোঁট; গোঁফের তাম্ররেখা এখনও স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই; দাঁতগুলি সাদা আর ছোট ছোট; বুকের কাটুনি নিখুঁৎ—নিটোল অথচ বলিষ্ঠ!

কোথাও বিধাতার এতটুকু কার্পণ্য নাই।

দলুয়া মাঝে মাঝে একটু নিরিবিলিতে থাকিতে চায়। তাই ভূমিকা করিয়া বলে—খাওয়া হয়েছে তোমার চন্দনা?

দরদ নয়—দরদের ভাণ!

কিন্তু দলুয়ার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যের গুণে চন্দনা রাগ চাপিয়া শুধু বলে—না।

তবে যাও না, ওঘরে গিয়ে খেতে বসো গে না। আমার সামনে যদি খেতে লজ্জা করে তা হলে' না হয় আড়ালে গিয়ে—

ঘাড় বাঁকাইয়া চন্দনা বলে—একলা এ ঘর আমি ফেলে যাবো না, বাবা রাগ করবেন।

তা ঠিক, আমি আবার মানুষ? কখন থাকি কখন যাই... আর এই বিদেশ, ধর যদি একটা চুরিই হয়ে গেল...উঃ, দেখেছ চন্দনা, কি রকম গরম পড়ে গেছে?...ঘরটা তুমি তা হলে বন্ধই করে রাখো।

বলিতে বলিতে মুখ কালো করিয়া দলুয়া বাহির হইয়া যায়।

সন্ধ্যার গা-ঢাকা অন্ধকারে আবার যখন আসিয়া নিঃশব্দে ঘরে ঢোকে, চন্দনা হয় ত তখন 'লনের' পাশে ফুল-তলায় বসিয়া থাকে। ঘরে ঢুকিয়া দলুয়া আলো জ্বালে না। প্রেতের মত অন্ধকারে সমস্ত ঘরের ভিতর,—কখনও আলমারির কাছে, কখনও সিন্দুকের কাছে, কখনও বাক্সের কাছে, কখনও বা ডেস্কের কাছে,—এমনি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত মানুষের চোখের আড়ালে

সে যে অত্যন্ত তাড়াতাড়িতে কি কাজ সারে, তাহা সে নিজেই হয় ত দেখিতে পায় না।

আবার তেমনি নিঃশব্দ পদসঞ্চারেই বাহির হইয়া যায়। এদিক ওদিক চাহিয়া কেবল দেখে, চন্দনা বা অন্য কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছে কি না।

তখন সে হাসিতে হাসিতে খামকা এখান-সেখান ঘুরিয়া বেড়ায়। হাসে,—কিন্তু অতি কষ্টে! নিজের প্রতি উদ্গত সহানুভূতিকে সে যেন হাসি দিয়া চাপা দেয়।

আপনার আচার-ব্যবহারের প্রতি তাহার যেন দরদ নাই, মমতা নাই, ইচ্ছা নাই,—কোনও অধিকারই যেন তাহার নাই।

…অথচ তাহার সমস্ত কৈশোর, জ্ঞান-উন্মেষের পর সমস্ত অভিশপ্ত দিনগুলিই ত এমনি ভাবেই কাটিয়া গেছে।

ডাক্তার দেখাইবার উপায় নাই। কে দেখে,—আর কেই বা খবর দেয়। লোক সবশুদ্ধ অনেকগুলি। পাঁচ ভূতের কাজ। কে কাহার তল্লাস রাখে তাহার ঠিক নাই।

দিনের পর দিন যায়, আর বুটরু তাঁবুর মধ্যে রোগ-পাণ্ডুর দেহ লইয়া পড়িয়া থাকে,—জঞ্জালের মত, পৃথিবীর অনর্থক বোঝার মত। শীর্ণ লোমশ হাত, পা, গা,—এক মুখ দাড়ি-গোঁফ, মাথায় একরাশ কটা রুক্ষ চুল; বুকের প্রচণ্ড যন্ত্রণায় নিজেই কোনও রকমে একগাছা মোটা দড়ি ফেরুয়া দিয়া বুকে বাঁধিয়াছে; গায়ে

মুখে কোথাও এতটুকু রক্ত নাই। আগের দিন হইতে গল মধ্যে নাকি হঠাৎ কি রকম ঘা হইয়াছে।

কোটর-প্রবিষ্ট ঘোলাটে চোখে মধ্যে কি এক রকম বি হলুদের আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গোয়ালাদের সে মেয়েটি দুধ দিতে আর আসে না; হয় অনাবশ্যক বোধে,—কিম্বা হয়ত ভয়ে!

মাঝে একটা পিওন আসিয়া একখানা চিঠি দিয়া গেছে চিঠিখানি খুলিবার সামর্থ্য হয় নাই। সে নাকি বলিয়া গেছে ঔষধি-বনের ইজারা প্রায় শেষ হইতে চলিল—কয়েক দিনে মধ্যেই সমস্ত কাজকর্ম্ম শেষ হইয়া যাইবে।

আবার দিন যায়। প্রতি দিনের প্রত্যেকটি ঘণ্টা ব্যথায় যন্ত্রণায়, অনাহারে, তৃষ্ণায় এবং দীর্ঘশ্বাসে জর্জ্জর হইয়া ওঠে।

রাত্রে আলো জ্বালিবার লোক নাই। কোন্ এক সময় তাঁবুর খোলা দরজা দিয়া ভিতরে খানিকটা চাঁদের আলো আসিয়া পড়ে। সেই আলোর আভায় দেয়ালে ঝুলানো রাইফেল, পিস্তল ছোরা-ছুরি, বর্শা, খোলা তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্রগুলো ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে। নির্জ্জন গভীর রাত্রে সেগুলি যেন জীবন্ত উজ্জ্বল মূর্ত্তি হইয়া, সহস্র তীক্ষ্ণ ভয়ঙ্কর চক্ষু মেলিয়া বুটুরুর ব্যথাতুর ভীত মুখখানার প্রতি চাহিয়া থাকে।

আর সেই দিন-রাত্রের প্রত্যেক মুহূর্ত্তটিতে একটি চঞ্চল লঘু মৃদু পদধ্বনি শুনিবার ব্যাকুল ব্যর্থ আশা!

কিন্তু চন্দনা আসে নাই।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় চাঁদ উঠিয়াছে। বোধ করি পূর্ণিমা তিথি। দুই ধারে নিবিড় বন-রেখা বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গেছে। অদূরে ঝরোকার জলে চাঁদের আলো পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতে-ছিল। ওপারে জেলেদের পাড়ায় ডুগ্‌ডুগি বাজাইয়া কাহারা গান ধরিয়াছে। চাঁদ উঠিলেই তাহারা এমনি নিয়মিত গান গায়।

অতি কষ্টে ধীরে ধীরে বুট্‌রু উঠিয়া বসিল। দারুণ দুর্ব্বলতা! হাত পা নাড়িবার পর্য্যন্ত সামর্থ্য নাই। মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। একটা লাঠিতে ভর দিয়া কোনও রকমে সে বাহিরে আসিয়া বসিয়া পড়িল। ঘোড়া নির্জীব হইয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে।

দক্ষিণ দিক হইতে তখন হাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছে। অনেকক্ষণ সেই হাওয়াতে বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। মুখের ভিতর হইতে এক প্রকার শব্দ বাহির হইতেছিল।

কতক্ষণ চোখ বুজিয়া সে সেইখানে বসিয়া রহিল তাহার ঠিক নাই। চোখ যখন খুলিল,— চাঁদের আলোয় চারিদিক তখন সাদা হইয়া উঠিয়াছে।

লাঠিতে ভর দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বুটরু উঠিয়া দাঁড়াইল। চোখ দুইটার মধ্যে অস্বাভাবিক দীপ্তি, রুক্ষ শীর্ণ মুখের ভিতর হইতে দাঁতগুলা ঠেলিয়া বাহির হইয়াছে। কি জানি কেমন করিয়া তাহার ভিতর আবার সেই আগেকার বন্য হিংস্র দানব-শক্তি ফিরিয়া আসিল। এ অস্বাভাবিক শক্তি যেন নিজের প্রতি

বিদ্রোহ, সমস্ত মানব জাতির প্রতি বিদ্রোহ,—বিধাতার প্র
বিদ্রোহ! চোখের মধ্যে তখন তাহার ভয়ঙ্কর জ্বালা ফু
উঠিয়াছে। দুর্ব্বলের দুঃখের ধন বলপূর্ব্বক লুণ্ঠন করিলে
নির্য্যাতিত ধ যত অপমানিত নিঃসহায় যেমন করিয়া অক
আত্মঘাতী ভীষণ শক্তিতে উজ্জীবিত হইয়া ওঠে…এও যেন তা

লাঠিতে ভর দিয়া টলিতে টলিতে বুড়ো চলিল।

রাস্তা ভাল নয়,—খোয়া, কাঁকর, খানা, উঁচু-নীচু। খা
পায়ে হাঁটা তাহার অভ্যাস নাই।

মাঝে মাঝে খানায় পড়িয়া পা অবশ হইয়া যাইতেছিল
হোঁচট্ খাইয়া ইতিপূর্ব্বে একটা পা ছিঁড়িয়া কাটিয়া গেছে।

…দিশাহারা, বিভ্রম, উন্মাদ; তবুও সেই সাংঘাতিক পথ চল

সমস্ত পথটা এম্‌নি টলিতে টলিতে চলিয়া সে ডাক্তারে
বাংলোর কাছে আসিয়া থামিল। বারান্দার দরজা বন্ধ। এ
সকাল সকাল আলো নেবে না। বুড়া এই সময়টায় প্রা
কন্যাকে লইয়া বাহির হয়।

এ হাতি 'লন'। ফুলগাছের বেড়া দেওয়া অনেকটা বাগানে
মত। মাঝে মাঝে গাছের ঝোপ। তাহারই পাশে হঠাৎ সাদ
কাপড় পরা চন্দনাকে সে সমস্ত চোখের সমস্ত দৃষ্টি দিয়া চিনিতে
পারিল।

একটা শিশুগাছে গা হেলাইয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। হ
করিয়া নিশ্বাস টানিতেছিল।

একটি সুন্দর ছোকরা ঘাসের উপর শুইয়া ঘুমাইতেছে। আর

তাহারই পাশে উবু হইয়া বসিয়া চন্দনা গলা বাড়াইয়া একদৃষ্টে নিঃশব্দে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে।

কি যে দেখিতেছিল তাহা সেই জানে ... ঝর ঝর করিয়া চোখ দিয়া তাহার জল গড়াইতেছে।

চন্দনার কান্না দেখিয়া বুট্‌কুর শুকনো রুক্ষ চোখ দুইটা পর্য্যন্ত হঠাৎ যেন জ্বালা করিয়া জল ভরিয়া আসিল।

একবার চন্দনা হাত বাড়াইয়া অতি মৃদু সেই ছেলেটির গা ছুঁইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সাহস হইল না—আবার হাতটা টানিয়া লইল।

আগুন লাগিলে শুকনো গাছ যেমন জ্বলিতে থাকে—বুটকু তেমনি জ্বলিতে জ্বলিতে দাঁতে দাঁত চাপিয়া হাত মুঠা করিল।

ক্ষুধাতুর সেই ধারালো নখ দিয়া সে যেন তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়।

কিন্তু তারও জন্য চন্দনা কাঁদে!

গাছের তলা হইতে সরিয়া গিয়া বুট্‌কু ডাকিল—চন্দনা!

কিন্তু তাহার স্বাভাবিক স্বর বাহির হইল না। হঠাৎ তাহার বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভয়ে চন্দনা বলিয়া উঠিল—কে?

ছেলেটি জাগিয়া উঠিল। বুট্‌কু তখন লাঠি লইয়া বসিয়া পড়িয়াছে। উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিয়া ছেলেটি তাকাইয়া দেখিল। বুট্‌কু চিনিল তাঁবুতে গিয়া এই ছেলেটিই একদিন তাহার সেবা করিয়াছিল! এবং সেই দিন হইতে তাঁবুর অনেকগুলি দামি জিনিস আর সে খুঁজিয়া পায় নাই।

তাহার প্রতি চাহিয়া বলিল—তুমি? তোমারই নাম দলুয়া?

দলুয়া ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল।

চন্দনা চলিয়া যাইতেছিল। হয়ত লজ্জায়—হয়ত বা ভয়ে!

বুটরু তাহার সমস্ত আবেগের কণ্ঠরোধ করিয়া দলুয়ার হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিল—রাজা তুমি ভাই, তুমি রাজা...

দলুয়া নির্ব্বাক।—

নিজের বীভৎস কদাকার লোমশ দেহের প্রতি চাহিয়া বুটরু বিকৃত কণ্ঠে আবার বলিল— তোমার কাছে আমি?...তুমি রাজা!

লাঠিটি হাতে লইয়া উঠিয়া সে আবার টলিতে টলিতে 'লনের' বাহির হইয়া গেল।

সুমুখে আবার সেই দুর্গম রাস্তা!

কিন্তু চোখের জলে সে রাস্তা আরও ঝাপ্সা হইয়া গেছে।—

দুপুর বেলা চন্দনা প্রায়ই ঘুমায়। আজও তাই। বাহিরে খর-রৌদ্রের মাঝে মাঝে ঘূর্ণী ধূলা উড়িয়া বেড়াইতেছিল। পাশের ঘরে বুড়া নানূহোরি ডাক্তারী বই মাথায় দিয়া ঘুমাইতেছেন।

হঠাৎ যেন কিসের স্পর্শে চন্দনা জাগিয়া চোখ তুলিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে দলুয়ার ডান হাতটা চাপিয়া বলিল—কি হচ্ছিল?

দলুয়ার হাতে তাহার কাণের একটা দুল! সে বলিল—না এই দেখছি...আচ্ছা অনেক দাম এ দুলের—নয়?...কিন্তু ভারি মানায় তোমাকে।

চন্দনা কিছুই বলিল না, হাতটা ছাড়িয়া দিয়া তাহার মুখের দিকে শুধু চাহিয়া রহিল।

দুলটা তখন মাটিতে রাখিয়া দলুয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সমস্ত ঘরে বারান্দায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনুভব করিতে লাগিল, চন্দনা তেমনি নিঃশব্দে তাহার প্রতি তাকাইয়া আছে।

সে কি চাহনি! চোখ দিয়া সমস্ত মনটা দেখিয়া লইতে চায়।

এক জায়গায় চুপ করিয়া সে দাঁড়াইল। চন্দনা চাহিয়া চাহিয়া পিছন দিক হইতে আসিয়া বলিল—এই নাও।

কাণের দুইটা দুল!

হাত সরাইয়া দলুয়া বলিল—না না, ওকি—ও যে হীরের…!

তা হোক—নাও ধর।

কিন্তু, দেখ চন্দনা, আমায় ওটা দিলে যদি,—তা ছাড়া—

হোক্ গে, ধর। ঘরের এত জিনিস নিয়েছ, এটা নিলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না...যাও, বারান্দা থেকে নেমে যাও। বাবার কাছে আর মুখ দেখিও না।

হাত পাতিয়া কাণের দুল দুটা লইয়া দলুয়া ভয়ে ভয়ে বারান্দা হইতে নামিয়া গেটের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া চন্দনা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—দুবেলা রোজ খেয়ে যেও এখান থেকে—এই দরজার কাছে বসে…থাকবার জায়গা নেই এখানে।

মাথা হেঁট করিয়া দলুয়া চলিয়া গেল।

...জীবনে আজ সে প্রথম ধরা পড়িল। প্রথম ধরা পড়িবার যে এতখানি লজ্জা, তাহা সে আগে জানি[illegible]।

আজ চন্দনা যেন তাহাকে তাহারই [illegible] চিনাইয়া দিল!

বাহিরে রৌদ্র তখন ঝাঁ ঝাঁ করি[illegible]। ঝড়ো হাওয়ায় ধূলা উড়িয়া মাঝে মাঝে চারিদিক অস্পষ্ট হ[illegible]ইতেছিল। প্রতিদিন এমনি ঝড় বয়, ধূলায় ধূলায় চারিদিক অ[illegible] হইয়া যায়,—আর বনে-বনান্তরে সাগরের গভীর নিশ্বাসের মত অশ্রান্ত মর্ম্মরধ্বনি শিহরিয়া উঠিতে থাকে।

দরজা খুলিয়া চন্দনা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অনেক দূরে জেলে-পাড়ার বাঁকে দলুয়া অদৃশ্য হইয়া [illegible] দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া সে পথে নামিয়া পড়িল।

ঔষধি-বনের কাজকর্ম্ম শেষ হইয়াছে, কুলিদের ছুটি হইয়া গেছে; শীঘ্রই এ বন ছাড়িয়া যাইতে হইবে। রাস্তার মাঝে মাঝে কুলি-কামিন্‌রা তাল পাকাইয়া হল্লা করিতেছিল।

পাশ কাটিয়া অন্য রাস্তা ঘুরিয়া চন্দনা [illegible]তেছিল।

সমস্ত পথ আসিয়া বুটরুর তাঁবুর কাছে সে দাঁড়াইল। তাঁবুর দরজা হাঁ হাঁ করিতেছে। ভিতরে মানুষও নাই—জিনিসপত্রও নাই। নানা জঞ্জালে ভিতরে পা বাড়াইবার উপায় নাই। ঝড়ো হাওয়ার দাপটে তাঁবুর দু' একটা দড়ি ছিঁড়িয়া [illegible]ছে; হাওয়া লাগিয়া পত্‌ পত্‌ করিয়া পর্দ্দাগুলার শব্দ হইতেছিল। তাঁবু কাৎ হইতে আর বিলম্ব নাই।

চন্দনা ফিরিয়া দেখিল, গাছের তলায় তাহাদের বড় আদরের

ঘোড়াটি বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে। মুখ দিয়া তাহার ফেনা গড়াইতেছিল।

যে পথ দিয়া সে আসিয়াছিল, আবার সেই পথে ফিরিয়া গেল।

দিনের আলো মুছিয়া গেছে; মন হইতেও গেছে,—চোখ হইতেও গেছে। বুকের ভিতর শুধু তরঙ্গ-আক্ষেপ; নৈলে চোখ বুজিয়া যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল একটা অপরিসীম, বিবর্ণ, নির্জীব, দীর্ঘ অবকাশ।

কণ্ঠস্বর বাহির হয় না,—ডিপ্থেরিয়া রোগে চিরদিনের জন্য স্বর রুদ্ধ হইয়া গেছে। বুনো জ্বরে দেহের ভিতরটা পচিয়া উঠিয়াছে।

হাঁসপাতালের একান্তে একখানি ঘরের মধ্যে···অনাদৃত, রোগ-জর্জ্জর, অসহায়,—অভিশপ্ত!

যেন মহামরণের ভূমিকা!

মাঝে মাঝে, সময়-অসময়ে দিনে-রাতে আচমকা সমস্ত শক্তি দিয়া দরজার দিকে তাকায়,—কেহ আসে কি না! বুনো, বিমূঢ়, আকুল, অসহায় দৃষ্টি!

কেউ আসে না!···আবার তাকায়!

আসে ডাক্তার! শিষ্ দিতে দিতে আসিয়া ঘুরিয়া যায়। আড়ে আড়ে তাকাইয়া সিগারেট টানে,—কাছে আসিয়া হেঁট

হইয়া বুট্রুকে একবার দেখে,—ভুরু কুঁচকায়। তারপর আবার চলিয়া যায়।

না দেয় ঔষধ, না পথ্য,—না করে [illegible]!

একদিন। দু'দিন। তিনদিন!

অচেতন দৃষ্টিতে বুট্রু দরজার দিকে তাকাইয়া থাকে। কখনও পলক পড়ে,—কখনও পড়ে না।

নাক দিয়া রক্ত গড়ায়—মুখ দিয়া ফেনা পড়ে।

আবার টানিয়া টানিয়া চোখ খুলিয়া তাকায়। চোখ দুটির উপর যেন চির-অন্ধকারের একটা ছায়া নামিয়া আসে।

... ...

নির্জ্জন নিঃশব্দ রাত! অন্ধকার—নিশুতি; নিদারুণ স্তব্ধতা!

দূর বনে গাছের শব্দ জাগে,—মৃদু মৃদু! কোথায় বুনো একটা জানোয়ার থাকিয়া থাকিয়া ডাকে।

রাত-জাগা পাখী একটা কোথায় চেঁচায়!

দরজাটি ধীরে ধীরে ঠেলিয়া দলুয়া ভিতরে ঢোকে,—নিঃশব্দে; চুপি চুপি!

আশপাশের অন্যান্য ঘরগুলিতে রুগীগুলা ঘুমাইতে থাকে; একজন ছাড়া,—যন্ত্রণা ভুলিবার জন্য মাঝে মাঝে সে গান গায়।

বুট্রুর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দলুয়া একবার তাকায়। পরে চাহিয়া চাহিয়া দেখে, তাঁবুর সমস্ত দামী জিনিসগুলি এখানে আসিয়াছে।

টিম্ টিম্ করিয়া বাহিরে সরকারি বাতিটা জ্বলে। ভিতরে খানিকটা অন্ধকার! অন্ধকারের ঘোঁজে ঘোঁজে দলুয়া হাত বাড়াইয়া দেয়; তাড়াতাড়িতে কি করে না করে তাহা নিজেরই জ্ঞান থাকে না।

অসাবধানে হঠাৎ নিজেই একটা শব্দ করিয়া ফেলে। গা কাঁপিয়া ওঠে। কি একটা গড়াইতে গড়াইতে ওধারে চলিয়া যায়।—টাকার শব্দ!

কিন্তু বুটুরুর সাড়া নাই।

কাছে সরিয়া আসে। কি একটা বাসনে পা লাগিয়া হঠাৎ ঠন্ করিয়া শব্দ হয়,—কিন্তু বুটুরু [illegible] না।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দলুয়া তা[illegible] দিকে তাকায়। পরে ইচ্ছা করিয়া নিজেই মাথার কাছে [illegible] শব্দ করে; পরে উঠিয়া গিয়া আলোটি বাড়াইয়া দিয়া আসে।

দেখে—বুটুরুর চোখ দুটি খোলা, পথের দিকে নিশ্চল হইয়া চাহিয়া আছে। চোখের কোলে টল্‌টলে জল!

আবার সে একটা শব্দ করে,—আবার! সে যে এই ঘরে আসিয়াছিল, আবার চলিয়া যাইতেছে,—এইটুকু যেন সে জানাইয়া যাইতে চায়।

এবার গলার সাড়া দেয়।—তবুও বুটুরু জাগে না।

অকস্মাৎ দলুয়ার পা দুইটা যেন ভারি হইয়া উঠিল। বাহিরে সেই নিরন্ধ্র তামসী রাত্রির প্রতি একবার তাকাইয়া সে সেইখানে বসিল। মাথায় যেন তাহার রোখ্ চাপিয়া গেছে; নানারূপ

সাড়া-শব্দ করিয়া সে উস্‌খুস্‌ করিতে লাগিল। কোনও রকমে সে জানাইতে চায়, এখানে তাহার অ[illegible] প্রবেশ; সে এখানকার কেউ নয়, একান্ত অপরিচিত সে[illegible]

হাতের বোঝাটা নামাইয়া হেঁট হই[illegible] একবার বসিল।—বুটুরু তেম্‌নি চাহিয়া আছে।

নিজের কদর্য্য প্রবৃত্তিটাকে লুকাইতে আজ তাহার ইচ্ছা হইল না। সাড়া-শব্দ করিয়া, গলার আওয়াজ দিয়া, হাত-পা নাড়িয়া, সে সেই নিশ্চল বীভৎস মুখখানার কাছে, পলকহীন শীর্ণ সেই চোখ দুটির কাছে নির্ব্বোধ মাতালের মত বারম্বার নিজেকে পরিচিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বুটুরু কিন্তু জাগে না। দুটি মৃত চোখ শুধু মেলিয়া থাকে।

পথের দিকেই বটে! যে পথে মৃত্যু আসিয়াছে; যে পথে চন্দনার আসিবার কথা!

দলুয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরময় খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া বেড়াইল। তারপর নিঃশব্দে শুধু হাতে অন্ধকারে বাহির হইয়া গেল।

জেলে-পাড়ায় জুয়ার আড্ডায় যায়, খেলে,—কিন্তু বার বার হারে। আবার ফিরিয়া আসে। তীক্ষ্ণ-তীব্র রৌদ্রে চারিদিক ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে থাকে; সুমুখের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপরের আকাশ ধূলায় ধূলায় অন্ধকার হইয়া আসে।

ঘুরিতে ঘুরিতে দলুয়া কতদূর যায়।

সুমুখে দূর খর রোদ্রে মাটির তলায় লুকায়িত পৃথিবীর তৃষিত

চেনা ও জানা

আত্মার দীর্ঘশ্বাস বিদীর্ণ মৃত্তিকায় ফাটল্ দিয়া ধূম্র-নীল আকারে আকাশের দিকে উঠিতে থাকে।

তারপর আবার জমাট বাঁধে দিনান্তের অন্ধকার! ক্ষুধাতুর রাত্রির অন্ধ আত্মা আলোকের তৃষ্ণায় সারা আকাশ লেহন করিতে থাকে।

প্রেতের মত মানুষের চোখের আড়ালে দলুয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া পায়চারি করে। নিজের মধ্যে নিজেকে উন্মাদের মত খুঁজিতে থাকে।

অন্ধকারে চারিটা চোখ যেন [illegible]র দিকে তাকায়। দুইটা চোখ ধারালো, তীব্র,—জীবন্ত [illegible] আর দুইটা মৃত, অপলক, সজল!

ওই চারিটি চোখের কা[illegible] ধরা পড়িয়া গেছে তাহার জীবনের সমস্ত পরিচয়টুকু!

এত বড় কলুষিত আত্মপরিচয়ের জন্য কে দায়ী! বিধাতা—না সে নিজে!

আবার দলুয়া ঘুরিতে থাকে।

লোহা-লক্কড় যন্ত্রপাতি চালান হইয়া গেছে। কুলি-কামিনরা বাস উঠাইয়া যে-যার চলিয়া যাইতেছিল।—[illegible]ক্ষেতে বীজ বুনিবার সময় আসিয়াছে। বড় বড় কাজ লইয়া দেশ-বিদেশ হইতে যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা আবার অন্য যায়গার 'ডাকে' চলিয়া গেল।

ঝাড়ে ঝাড়ে ঔষধি-লতা জাহাজে চালান গেল, গাছ-কাঠ গেল

রেল-কোম্পানীতে ; খাঁচায় পুরিয়া জন্তু-জানোয়ার চিড়িয়াখানায় চালান হইল।

তারপর বিদায়ের পালা—

সেদিন দেখা গেল, পাকা রাস্তা দিয়া সারবন্দী হইয়া সব চলিয়াছে।

আগে চলিয়াছে মাল-পত্র, তার পিছনে তাঁবুর সাজ-সরঞ্জাম, তারপর কুলি-মজুর, তাহাদের পিছনে সাহেব-সুবা, কণ্ট্রাক্টার, ইঞ্জিনিয়ার, বোটানিষ্ট, তারপর দোকানপাতি,—রসদের গাড়ী। পরের গাড়ীতে হাঁসপাতাল, পুলিশের লোকজন, গোরা সৈন্য, ভোলাণ্টিয়ার।

তাহাদের পিছনে একখানা গাড়ীতে অনেকগুলা মৃতদেহ চলিয়াছে। শহরে গিয়া মড়া সনাক্ত করিলে তবে তাহাদের সংকার হইবে।

ডাক্তার নানুহোরি আলাদা গাড়ীতে চলিতেছিলেন। বৃদ্ধা ধাত্রীকে সঙ্গে করিয়া চন্দনা পরের গাড়ীতে বসিয়াছিল।

চন্দনার চোখদুটি এতক্ষণে জলে ভরিয়া উঠিল। গেল কাল সে বুটুকর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছে।

বনপথে আঁকিয়া-বাঁকিয়া মন্থর গতিতে সব চলিয়াছে। ইষ্টিশানের পথে।

পথের ধারে দাঁড়াইয়া দলুয়া বিদায়-সমারোহ দেখিতেছিল। চন্দনার গাড়ী দেখিয়াই সে নিকটে সরিয়া গেল! কানের সেই

ছল দুইটা বাহির করিয়া চন্দনার কোলের কাছে রাখিয়া বলিল—এ আমার চাইনে চন্দনা······নিয়ে যাও তুমি।

উদ্গত অশ্রু চাপিয়া সে পিছন ফিরিল।

গলা বাড়াইয়া চন্দনা বলিল—যাবে না আমাদের সঙ্গে ?

দলুয়া উত্তর দিল না। মুখের দিকে একবার চাহিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

তাহার পথের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া চন্দনা চোখের জল মুছিল।

অকস্মাৎ সেদিন রাত্রে ঘন বনস্পতির মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

কেউ বলে দাবানল,—কেউ বলে—না; এ কোনও শত্রুর কাজ। শোনা যায়, এই অগ্নিকাণ্ডের সম্পর্কে একটি সুন্দর ছোক-রাকে জেলার পুলিশে নাকি গ্রেপ্তার করিয়াছে।

তা সে যাই হোক—

গাছ পুড়িল, বন পুড়িল, মাটি পুড়িল। দিকে দিগন্তরে শুধু লাল আভা জাগিয়া রহিল।

আর সেই বিরাট অগ্নিকাণ্ডের আশে পাশে একটা পথহারা বেওয়ারিশ ক্ষ্যাপা ঘোড়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হয়ত প্রাণভয়ে—

হয়ত বা তাহার মৃত হতভাগ্য প্রভুর উদ্দেশে—।

ছদ্মবেশ

ছাপা ছবি অনুসারে ভারতমাতার একেবারে শিয়রে—যেখানে তিনি এলোচুল ছড়িয়ে আছেন উত্তর দিক থেকে সুদূর পূব দিকে—

গৃহস্থের ঘর নয়, গাঁ নয়, সহরও নয়। পাহাড় পর্ব্বত, উপত্যকা, গিরি-নদী, চিড় আর পাইনের জঙ্গল, বেওয়ারিশ মেওয়ার ক্ষেত, —পশুপক্ষীর যেখানে অবাধ রাজ-রাজত্ব!

বছরের এই সময়টায় তীর্থযাত্রীর ভিড় লাগে। দেখা যায় সানুদেশ অতিক্রম করে' পিপীলিকা-শ্রেণীর মত যাত্রীর দল পাহাড়ের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করে। পায়ে পায়ে পথ তৈরী করে হেঁটেই যায় বেশি লোক। কেউ যায় উটের পিঠে, কেউ বা টাট্টু ঘোড়ায়। গরম কালের রোদে শীত একটুখানি কম; এ সময় বরফ গল্‌তে থাকে। পথে ঝড়-বৃষ্টি হওয়া বিপজ্জনক।

চেনা ও জানা

শরৎকালের প্রথমেই সকল যাত্রীর ফেরবার কথা। সরকারের তরফ থেকে যে পথটি বরফ কেটে যাত্রীদের জন্য তৈরী করে দেওয়া হয়েছে, সে পথে কিন্তু কয়েকদিন থেকে কোনো যাত্রীর তল্লাস পাওয়া যাচ্ছে না। লোকের সন্দেহ সত্যিই হলো। খবর এলো, ফেরবার পথে প্রচণ্ড বর্ষা হয়েছে; যাত্রীদের শুধু পথই বন্ধ হয়নি—কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঠাণ্ডায় বরফ পড়ে গেছে প্রায় দশ ফিটের ওপর। এরই মধ্যে বহু যাত্রী বরফের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সাজ সাজ রব পড়ে গেল।—

পাহাড়ের পথে যাওয়া-আসার কোনো সুবিধে নেই। নানা-দিক থেকে সরকারি 'রিলিফ' ছুটোছুটি করতে লাগলো। সন্ধান মিললো অল্প লোকেরই। জায়গায় জায়গায় উত্তাপের জন্য আগুন জ্বলতে লাগলো। ঘোড়ার পিঠে কম্বলের বস্তা ছুটলো। সঙ্গে গেল গমের আটার ব   গরুর দুধ, আর আঙুর-চোঁয়ানো মদ।

পথের সরাইখানা   । একেবারে হাসপাতাল হয়ে উঠলো।

বেশির ভাগ লোকের   ত্তাই পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যেই বহু লোকের তুষার-সমাধি হয়ে গেছে। কম সে কম প্রায় তিন শো লোক ত বটেই।

মরণ-সমারোহের সে এক ভয়াবহ দৃশ্য!

ফিরে এল যারা তাদের কেউ আধমরা, কেউ মর মর। কারো পক্ষাঘাত হয়েছে, কারো গলার আওয়াজ রুদ্ধ হয়েছে, কারো বা গায়ের রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। দু চারটে পাগলও হয়ে গেছে বুঝি।

চেনা ও জানা

কয়েকদিনের অক্লান্ত সেবায় যারা বেঁচে উঠলো, তাদের কারো হারিয়েছে বাপ, কারো মা, কারো বা সঙ্গী। হাহাকার করতে করতে সকলেই দেশে ফিরতে লাগল।

গোলমালটা একটু কমে গেছে ঠিক সেই সময়টায়। জায়গা-টার নাম ঠিক জানা নেই। পাথরের রাস্তাটার খানিক নীচেই ঘরখানি। লতায় পাতায় ছাওয়া। মাটির ছাত; ছাতের ওপর নানারাঙর ফুল ফুটে আছে। নীচে অগাধ গভীরতা,—ঘন জঙ্গলের রেখা তরঙ্গিত হয়ে নীচে নেমে গেছে।

ঘরখানি থেকে পা বাড়িয়ে মেয়েটি ডাকলে—শুনুন?

চমকে ওঠবারই কথা। রোগা লম্বা লোকটি হঠাৎ পেছন ফিরে এমন ভাবে তাকালো যেন সাপ দেখেছে।

কাছে যেতে মেয়েটি বললে—ঠাকুরের আশ্রমের লোক বুঝি আপনি? তা ত গেরুয়া দেখেই মনে হয়।

লোকটি প্রথমে কথা কয় না। মেয়েটি আবার বললে—আপনি বাঙালি?

হ্যাঁ।

তা আগেই বুঝেছি। বাঙালি যতই খাঁটি সন্নিসি হোক, নেংটি সে কিছুতেই পরতে পারে না। আপনাদের আশ্রম কতদূরে?

লোকটির বিস্ময় বোধ হয় এতক্ষণে কেটে গেল। বললে—বাঙালির মেয়ে হয়ে আপনি এখানে?

চেনা ও জানা

বিধাতার অক্লান্ত দুটি হাত পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনশ্রী মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছে। বললে—আমার নাম জয়া।

করুণ ঘটনা। বাপের সাথে তীর্থে এসেছিল। পাড়ার একটি স্ত্রীলোকও সঙ্গে ছিল। তুষারের মধ্যে বাপের সমাধি সে দেখেছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। স্ত্রীলোকটি আগেই নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল।

সব শুনে লোকটা বললে—আর আপনি?

আমি অনেক কষ্টে একটা উঁচু গাছের ডালে উঠলাম। মুখে, চোখে, মাথায়, কাপড়ে বরফ পড়ে তখন ভারি হয়ে গেছি। সেই গাছের ওপর সারা রাত রইলাম। পরে কখন্ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছি জানিনে। চেয়ে দেখি আগুন জ্বল্‌চে, গায়ে আমার এক-খানা কম্বল, পাশেই একটা পাহাড়ি লোক বসে বসে বেহালা বাজাচ্ছে।

এখানে এলেন কি ক'রে?

সেই লোকটাই নিয়ে এল। লোকটা হিন্দু, ভারি ভালো লোক। কথাবার্ত্তা কিছুই তার বুঝতে পারিনে। মা বলে' আমায় ডাকে, তাই শুধু বুঝতে পারি। এখন কি করবো বলতে পারেন?

মেয়েটি সজল কণ্ঠে পুনরায় বললে—একলা ছিলাম তাই সাহসও ছিল, আপনাকে দেখে এতক্ষণে মনে হচ্ছে আমি মেয়ে-মানুষ হয়ে কি করতে পারি!

লোকটি বললে—মানুষকে বাঁচানোই আমাদের কাজ। পরে

সে কি করবে না করবে অত আমরা দেখিনে। আপনি বাঙালী বলে কিম্বা স্ত্রীলোক বলে বেশি সুবিধে পেতে পারেন না।

জয়া বললে—তার মানে আপনি কিছুই সাহায্য করবেন না—এই ত? তা বেশ। সুবিধে পেলে আমি নিজেই সুবিধে করে নিতে পারবো। আমাকে শুধু আপনি পথ-ঘাট দেখিয়ে দিন্।

লোকটি বললে—কিন্তু—

কিন্তুর কথা আমি জানি—বোকা নই। বাবা আমাকে পয়সা খরচ করে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। কিন্তু মানে আমার এই দেহটা আপনাদের আশ্রমে গিয়ে ভারি গোল বাধাবে—কেমন? ভয় কি! আপনারা একে সন্নিসি, তাতে আবার ঠাকুরের চেলা। মানে কামিনী আর কাঞ্চনের শত্রু! গোড়ায় গলদ না থাকলে আমার এই সামান্য উপকারটুকু ঠিক্ করতে পারবেন!

আপনি দেশে ফিরবেন ত?

নৈলে কি আপনাদের আশ্রমে সংসার পাত্‌বো? বরং দেশে ফেরবার সুবিধে পেলে আপনাদের ওখানে রাত্রিবাসও করবো না। দাঁড়ান আসছি।

ঘরে ঢুকে পুরু কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে আসতেই সেই পাহাড়ি লোকটার সঙ্গে দেখা। জয়া বললে—আসি বাবা, অনেক কষ্ট দিয়ে গেলাম।

আশ্রমের লোকটি সরে' গিয়ে তার সঙ্গে কি কথাবর্ত্তা বললে। লোকটার বোধ হয় একটু মায়া পড়ে গিয়েছিল। মেয়েটি যে আশ্রয় পেয়েছে, ও লোকটি যে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো—এ

কথাও সে বুঝতে পারলো বোধ হয়। তার সেই গোঁফ-দাড়ির জঙ্গলের ভিতরে টক্‌টকে রাঙা মুখখানায় একমুখ হেসে ঝোলা-ঝুলির ভিতর থেকে একটি বেহালা ও ছড়্‌ বার করে বাজাতে বাজাতে সঙ্গে চলতে লাগলো।

কিছুই সে চায় না—শুধু সঙ্গে যাবে। জনবিরল পর্ব্বতের ধার দিয়ে যেতে যেতে সঙ্গীদের কানে সে শুধু অরণ্যের সুর শুনিয়ে দেবে।

সত্যিই তাই। অনেক দূর গিয়ে বাজনা থামিয়ে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে প্রণাম করে লোকটা ফিরে গেল।

নিশ্বাস ফেলে তার পথের দিকে একবার চেয়ে জয়া বললে—অসময়ের আত্মীয়—কি বলেন?

লোকটি বোধ হয় কি ভাবছিল। বললে—হুঁ।

আবার দুজনে চলতে থাকে। পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটতে পা ভারি হয়ে আসে, কিন্তু সেদিকে কারো হুঁস নেই। পথের বাঁকে বাঁকে এক একটা অদৃশ্য ঝর্ণার ঝিরঝির করে' শব্দ হতে থাকে।

জয়া এক সময় বললে—আপনাকে ডাকবো কি বলে? নাম আপনার আকাশানন্দ কি বাতাসানন্দ, জেনে রাখা ভালো।

একটু থেমে লোকটি বললে—ভবানন্দ!

ও নামে ডাকা কিন্তু বিশেষ সুবিধে হবে না। নামটাও যেন গেরুয়া রঙে ছোপানো। তার চেয়ে ঠাকুরের বংশধর আপনারা, স্বামীজি বলে ডাকাই ভালো। ওটাতে রসও আছে, সন্ন্যাসও আছে—কি বলেন?

আশ্চর্য্য মেয়ে, অদ্ভুত। এ অবস্থায় স্ত্রীলোক হয়ে কেউ যে তামাসা করতে পারে, আর সে তামাসা যে এমনি ইস্পাতের মত —এ ধারণার অতীত।

খানিক পথ চলে এসে জয়া আবার বললে—কতদিন আপনি এ দেশে আছেন?

তা বছর খানেক হল।

সংসার ছেড়ে দিয়ে এসেছেন, না সংসার না হওয়ার দুঃখে! বে থা হয়েছিল?

সে কথা আমাদের বলবার যো নেই।

যদি কেউ জিজ্ঞেসা করে? মিথ্যে কথা বলেন বুঝি?

আমরা উত্তর দিই নে।

নামটাও ত' ভাঁড়ানো দেখছি, আগে কি নামে চলতেন?

লোকটি কোনো উত্তর দিল না।

জয়া এবার হাসলে। হেসে বললে—তা হলে আট ঘাট বেঁধে' সন্নিসি হয়েছেন। এক চুল এদিক ওদিক হবার জো নেই। বেশ!

বাঁ দিকের ঢালু পথে নেমেই ডান দিকে আর একটা সরু রাস্তা। দুধারে বুনো-গোলাপের ক্ষেত। মাঝে মাঝে চামেলীর ঝাড়। একজায়গায় কতকগুলো কাঁচা আখ্‌রোটের গাছ।

আগে আগে এসে ভবানন্দ আশ্রমে ঢুকলো। জয়াও এল পাশে পাশে। পিছন ফিরে একবার তাকাতেই জয়া বলে উঠলো —থাক্ থাক্, অভ্যর্থনা আর কর্ত্তে হবে না, ও ত্রুটি আমি নিজেই

সেরে নেবো। শাঁখ বাজিয়ে অভ্যর্থনা করলে হয় ত আপনারাই বিপদে পড়বেন।

নারীর কণ্ঠস্বর শান্ত গাম্ভীর্য্যের মধ্যে যেন একটা তরঙ্গ তুললে। অবশ ও অসাড় আশ্রমের মধ্যে যেন প্রাণের স্পন্দন খেলে যেতে লাগলো।

আশ্রমবাসী কয়েকজন বেরিয়ে এল। তারা ত অবাক্। ভবানন্দ তাদের একে একে ইতিবৃত্ত বলতে লাগলো।

জয়া বেড়িয়ে বেড়িয়ে বললে—আঃ বাঁচলাম। কি ভাগ্যি আপনাদের এখানে ধুনির ধোঁয়া নেই! ভাঙ-গাঁজার সেবাও বোধ হয় চলে না—না স্বামীজি?

একজন বললে—আজ্ঞে না, এখানে ওসব নিয়ম নেই।

বা রে, আপনিও যে বাঙালী দেখছি। ছেলে মানুষ বয়েসে আপনার আবার এ শাস্তি কেন? কই, আমাকে কোথায় ঠাঁই দেবেন দেখি?

একটি ঘর দেখিয়ে দেওয়া হল। ঘরের মধ্যে সন্ন্যাসীর চেয়ে গৃহবাসীর সরঞ্জামই বেশী। বিছানাপত্র, বাক্স, বই, লেখাপড়ার আসবাব, মহাজনদের ছবি, তামা ও পিতলের বাসন—এমন কি ছোট্ট একখানি আয়না পর্য্যন্ত।

দেখে দেখে জয়া বললে—মন্দ নয়! আপনাদের দলে ভর্ত্তি হতে ইচ্ছে হচ্ছে।

সকল কথার উত্তর দেওয়া চলে না। তার চঞ্চল ভাব-ভঙ্গী দেখে সকলে মুখ চাওয়াচায়ি করে।

ছুটিমাত্র বাঙালী সন্ন্যাসী। দ্বিতীয়টির নাম প্রেমানন্দ। সে বললে—ওই ঘরে থাকুন, যদি কিছু দরকার হয় তা হলে জানাবেন, আমরা ওই দিকটায় থাকি।

জয়া বললে—এ ঘরে কে থাকতেন?

যিনি থাকতেন তিনি ক'দিন ভ্রমণে বেরিয়েছেন।

তাই ভালো। আমি ভাবলাম আপনারাই কেউ হবেন বুঝি। ছল্ করে বার বার এ ঘরে আসবার জন্যেই আমাকে এ ঘরটি দিলেন!

লজ্জায় প্রেমানন্দ পালিয়ে গেল।

সন্ধ্যা হয়।—প্রেমানন্দ এদিক ওদিক ঘুরে রান্নার জোগাড় করে আনে। আটা, ডাল, ঘি, কয়েকটা তরকারী, কতকগুলি জ্বালানি কাঠ,—সবগুলি এনে এক জায়গায় নামায়।

ভবানন্দ বলে—এত সব আনতে গেলে কেন, আজ ত আর ভোগ নেই, নিজেদের মধ্যেই—

কেন যে এত সব আনা, সে কৈফিয়ৎ প্রেমানন্দ আর দিতে পারে না, শুধু জয়ার ঘরের দিকে একবার তাকায়। পরে বলে—কিছু কিছু নিয়ে ওঁর কাছে দিয়ে এসো।

ভবানন্দ বলে—তুমিই যাও না হে। আমাকে আর—

ভবানন্দর বোধ হয় ভয় করে। জয়ার সঙ্গে দেখা হওয়াটাই যেন একটা ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে। মেয়েটার আয়ত চোখ দুটো শুধু উজ্জ্বলই নয়, দৃষ্টিও ভারি তীক্ষ্ণ! মুখের দিকে চেয়ে

কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত কখন্ কি আবিষ্কার করে ফেলবে তার ঠিক নেই!

ওই আসছে বুঝি—। ভবানন্দ ঘরে গিয়ে ঢোকে।

প্রেমানন্দ লাজুক কিন্তু সঙ্কোচ বিশেষ নেই। বয়স তার অল্পই কিন্তু এরই মধ্যে অতি সংযমের কর্কশ কাঠিন্য তার সর্ব্বাঙ্গকে ঘিরে ধরেছে।

জয়া বেরিয়ে এসে বললে—একটি কথা না বললে আর চলচে না, বুঝলেন ছোট ঠাকুর মশাই?

কি বলুন না?—প্রেমানন্দ মুখ তুলে বললে।

আপনাদের এখানে হিঁদুয়ানী দেখছিনে। মেয়ে মানুষ হয়ে সেই কবে থেকে এক বস্ত্রে আছি, একটা উপায় বলে' দিন্?

প্রেমানন্দ এদিক ওদিক তাকায়। গৃহস্থের ঘর নয় যে শৃঙ্খলা থাকবে। তবু বলে—দাঁড়ান্ দেখি।

ঘরে গিয়ে খানিক বাদে সে বেরিয়ে আসে। একখানি গেরুয়া থান মাটিতে নামিয়ে দিয়ে বলে—আজকের মত এখানা যা হ'ক করে'—

আ ছি ছি! একে থান, তাতে আবার সন্নিসি-রঙের। জাত-ধর্ম্ম আমার আর কিছুই রাখলেন না দেখছি। একবার আমার গায়ে উঠলে এ কাপড় বোধ হয় আপনারা আর ব্যবহার করবেন না?

এ কথার উত্তর প্রেমানন্দর মুখে জোগায় না। হাসতে হাসতে কাপড়খানি নিয়ে জয়া ঘরে গিয়ে ঢোকে।

কাঠের গোছা হাতে নিয়ে সরে গিয়ে প্রেমানন্দ বলে—এই নিন্, উনুন ধরান, আমি সব এনে দিচ্ছি।

জয়া হঠাৎ খিল্ খিল্ করে' হেসে বলে—এবার যে গণ্ডীর মধ্যে ঢুকে এলেন, এ ত' আপনাদের নিয়ম নয়?

মেয়েটার মুখে কিছুই আট্‌কায় না।

কাছে এগিয়ে এসে ভবানন্দ বলে—বলতে পারলে না যে, আপনাকে এখানে এনে গোড়াতেই নিয়মভঙ্গ করা হয়েছে?

কিন্তু কেন যে বলতে পারে না, তা দুজনেই মনে মনে অনুভব করে।

খানিক বাদে কাঁচা তরকারী, আটা, নুন, মসলা, প্রভৃতি হাতে নিয়ে প্রেমানন্দ গিয়ে বলে—এবার রাঁধতে বসুন, আলো জ্বেলে দিচ্ছি—ওই যা, ঘি আনতে ভুলে গেছি।

আবার ছুটে গিয়ে প্রেমানন্দ ঘি নিয়ে আ... আসতেই জয়া বলে—এ সব কি হবে?

প্রেমানন্দর এইবার হাসি পায়। বলে—কিছু খাওয়া ত চাই?

চাই বৈ কি, কিন্তু আমি রাঁধতে পারবো না, হাত-পা কামড়াচ্ছে।

কিন্তু তা হলে—

তা হলে কিছু নেই। ঝরণার জল খেয়ে আজকের মত পড়ে থাকবো। আমাকে এখানে এনে আপনাদের নিয়ম... করা উচিত হয়নি। আপনাকে আমি বলছিনে, যাঁকে ব...হ তিনি ঠিক আমার কথায় কান পেতে আছেন।

ভবানন্দ বেরিয়ে এসে বলে—আপনি আসবার জন্যে আমায় অনুরোধ করেন নি ?

অনুরোধ আপনি শুনলেন কেন ? সন্নিসি হয়ে সামান্য অনুরোধটাও এড়াতে পারলেন না ? আরও যদি দুএকটা বেফাঁস অনুরোধ করে বসি, আপনি রাখবেন ?

নিজের কথায় জয়া নিজেই হেসে ফেলে। এবং তার সেই হাসি চাবুক মারতে মারতে ভবানন্দকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়।

প্রেমানন্দ তার পথের দিকে তাকিয়ে চুপি চুপি বলে—রেগে গেছেন !

চুপি চুপি কথা বলা এই প্রথম। জয়াও চুপি চুপি উত্তর দেয়। বলে—ওঁর মতন লোককে সত্যিই আমার ভাল লাগে না।

জয়া পিছন ফিরে চলে যায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রেমানন্দ তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে। মনে হয়, গেরুয়া কাপড়খানার রঙ এবার সত্যিই খুলেছে !

শেষ পর্য্যন্ত প্রেমানন্দকেই রাঁধতে হলো বটে। জয়া বললে —বেশ ত, আপনাদের আশ্রয়ে এসেছি, একদিন না হয় রেঁধেই খাওয়ালেন ! তা ছাড়া আপনাদের মতন যোগী-ঋষির পেসাদ্ পাওয়াই কি কম ভাগ্যের কথা !

আজ কেমন করে যেন প্রেমানন্দর মুখ খুলে যায়। কথা বলবার একটি অপরিচিত অবরুদ্ধ আবেগ তার কণ্ঠের কাছে এসে ঠেলাঠেলি করে। বলে—আপনি অতিথি, আপনার সেবা করা ত আমাদেরও ভাগ্যের কথা !

হেসে জয়া শুধু বলে—আমার সেবা করায় বিপদ আছে কিন্তু!

মাটির কলসী নিয়ে প্রেমানন্দ জল আনতে যায়। ঝর্ণার জলের বিরাম নেই, ঝর ঝর শব্দে জল পড়ছে। কলসীটা নিয়ে সে মুখের কাছে ধরে।

ভবানন্দ পিছনে এসে দাঁড়ায়। বলে—শুনচ হে?

অন্ধকারে পিছন ফিরে প্রেমানন্দ বলে - কি?

ওঁর সঙ্গে অত করে' কথা বলবার দরকার নেই। তুমি আমি ত একা নই, এখানে অন্য লোকও আছে। এর পরে তাদের মুখে হাত চাপা দেওয়া যাবে না।

আমি ত এমন কিছুই,—শুধু বলছিলাম যে,

কি বলছিলে তা আমি শুনেছি। ও রকম স্ত্রীলোকের সঙ্গে, —বুঝতেই ত পারো। কালকেই ওঁর যাবার ব্যবস্থা করতে হবে!

বলেই ভবানন্দ অন্য পথ দিয়ে চলে গেল।

রান্নার জোগাড় করে নিয়ে বসতেই জয়া বললে—ছোট স্বামী-জী, আপনি রুটি সেঁকতে থাকুন আর আমি তরকারি কুটে দিই —কি বলেন? তা হলে বোধ হয় দেখতেও মন্দ হবে না।

কথা কইতে প্রেমানন্দর ভয় করে। কিন্তু জয়ার নিঃশব্দ হাসির দিকে চেয়ে এক সময় সে বলে—আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমি নিজেই—

জয়া বলে—ভয় নেই। আমার ছোঁয়া আপনারা খাবেন না সে আমি জানি। মেয়েমানুষের কোনো দামই আপনাদের কাছে

নেই। আচ্ছা, আপনি বুঝি লেখাপড়া ছেড়েই এ পথে এসেছিলেন?

প্রেমানন্দ কোনো উত্তর দেয় না। সলজ্জভাবে নিজের কাজ করে' যায়।

রান্নার পর অতি যত্নে খাবার সাজিয়ে সে ঘরের মধ্যে দিয়ে আসে। এই একান্ত যত্নটুকুই যেন তার সম্বল! এই মেয়েটি আপনার কথা-বার্ত্তায়, রসে-তামাসায় ভাবে-ভঙ্গীতে তাদের অনভ্যস্ত রুক্ষ জীবনে অল্প সময়টুকুর মধ্যে যে লাবণ্যের সঞ্চার করেছে—এই যত্নটুকু যেন তার শেষ প্রতিদান!

বলে—যা দরকার হয় চেয়ে নেবেন কিন্তু।

খেতে খেতে জয়া বলে—দরকার আমার অনেক। তা বলে' চাইবোই বা কার কাছে, দেবেই বা কে!

কেন?

মুখ তুলে হেসে জয়া আবার বলে—আপনারা ভারি বোকা! মেয়েমানুষ হয়ে পুরুষ মানুষের কাছে কি খাবার জিনিস চাওয়া যায়?

বাঃ সে কি, আচ্ছা তবে আমিই বুঝে নেবো।

ঠিক বলেছেন! তবে বুঝে নেবার শক্তি কি আর আপনাদের আছে? অনেক কাল আগেই সে শক্তি বোধ হয় আপনাদের শুকিয়ে গেছে।

প্রেমানন্দর মাথা যেন গুলিয়ে যায়। বাইরে এসে চুপ করে' সে নিবন্ত আগুনের দিকে চেয়ে বসে থাকে। মেয়েটা কথায়

কথায় কোন্ পথ দিয়ে কোথায় নিয়ে যেতে চায়, তার কোনো কুল-কিনারা নেই।

আশ্রমবাসী একে একে সকলেই আসে। চার পাঁচ জন হবে। সকলেই নিজের নিজের খাবার ভাগ করে' নেয়। একজন স্পষ্টই বললে—যা বললে তা অবশ্য বাঙলা ভাষাতে নয়।

এত পরিশ্রমের পরও রাতের বেলা কারো ঘুম আসে না। ভবানন্দ বলে—পিশু পোকার উৎপাতে চোখটি বোজবার যো নেই।

প্রেমানন্দ পাশেই শোয়—অন্য একটা 'চারপাই'তে। সে বলে—আজ বুঝি বেশি করে কামড়াচ্ছে? কম্বলগুলো রোদে দিলেই হতো।

আজ আর তেমন শীতও নেই—গরম! দরজা জান্‌লা খুলে রাখলেই চলে। তোমারও যে ঘুম আসচে না দেখছি।

প্রেমানন্দ বলে—এইবার আসবে! ঘুম এলে আমি আর জেগে থাকতে পারি না, ওই আমার দোষ।

আবার খানিকক্ষণ যায়। ভবানন্দ বলে—ঘুমুলে?

উঁহু।

খাবার জল এখানে বোধ হয় নেই? গলাটা শুকিয়ে গেছে।

এনে দেবো?—বলতে বলতেই প্রেমানন্দ উঠে বসে।

দাও।

জল খেয়ে ভবানন্দ বলে—উনি শুয়েছেন জানো? একবার দেখে এলে হতো। না হয় আমিই যাচ্ছি।

প্রেমানন্দ হেসে বলে—যাও।

না না বাপু—থাক্, তুমিই যাও। উঠেচ যখন, তখন তুমিই যাও। মানুষটাকে ত আর ভয় করে না, মুখখানাকেই ভয়! কি বলবেন এখুনি তার ঠিক নেই!

প্রেমানন্দ গিয়ে দেখে আলোও জ্বলছে, জয়াও সেই থেকে বসে আছে। বললে—এখনো ঘুমোননি যে?

জয়া বললে—এত রাত্রে আমার ঘুম দেখতে এসেছিলেন নাকি? অতিথির ওপর এত' আপনাদের [illegible]ক অনুগ্রহ!

হঠাৎ লজ্জায় প্রেমানন্দ রাঙা হয়ে উঠলো। বললে—তা নয়, বলছিলাম যে একটা বালিশ পেলে বোধ হয় আপনার সুবিধে হতো!

তা হতো! আপনারা বালিশও ব্যবহার করেন নাকি?

বালিশ আনতে গিয়ে সে দেখে দরজার কাছে ভবানন্দ ভূতের মত দাঁড়িয়ে। বললে—বালিশ চাই নাকি? এই নাও।

মানুষকে বোঝা ভার। [illegible]নন্দ একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে বালিশটা হাত থেকে নিয়ে জয়ার ঘরের দোরে এসে বললে—এই নিন্। কম্বল চাই?

না। এইবার আপনারা শুনুগে। কষ্ট করে' আর ঘন ঘন আমায় দেখে যেতে হবে না। আচ্ছা, স্বামীজি আমায় এখানে এনে সত্যিই কি একঘরে করে' দিলেন না কি?

না, উনি অমনিই শান্ত লোক। বিশেষ কারো সঙ্গে—

—তাহলে সংসারে আমিই শুধু বাচাল? যান্ আপনি ভারি দুষ্টু।

দুষ্টুর চেয়ে বোকাই বোধ হয় বেশি।—বলে প্রেমানন্দ সরে' এল।

গলা বাড়িয়ে জয়া বললে—আমা[illegible]ই মনে হয়! স্বামীজিকে বলবেন, মেয়েদের ঠাট্টা বো[illegible]শক্তিও তাঁর লোপ পেয়ে গেছে।

নিজের মাথার বালিশটি দান করে[illegible]কারে দাঁড়িয়ে স্বামিজী তখন যা ভাবছিলেন, তা অন্ততঃ নিবৃত্তি মা[illegible]র ভাবনা নয়!

সে রাত্রি প্রভাত হল বৈ কি।

কথাটা জয়া নিজেই বললে—আপনাদের উপকার ভোলবার নয়। তা বলে আমি ত আর এখানে ঘর কর্ত্তে আসিনি। দয়া করে এবার আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন্।

প্রেমানন্দ বললে—ডাকঘর এখান থেকে অনেক দূরে। তা হোক, আপনি ঠিকানা দিন, আমি একটা তার করে' দিয়ে আসি।

এবারে আর ঠাট্টা তামাসা নয়। জয়া বললে—আপনারা কি ভেবেছেন যে আমার অঢেল আত্মীয়? খবর দিলেই সব ছুটে আসবে?

প্রেমানন্দ বললে—তা হলে—

কেউ আমার নেই, তা জানেন? বুড়ো বাপ শুধু ছিল, তাঁর যে এমন অপঘাত মৃত্যু হবে তা কে জানতো বলুন? তীর্থ করাতে এনেছিলেন, ভেবেছিলেন বুঝি তাঁর মেয়েটি ধর্ম্মপথে থাকলে

অর্দ্ধেক রাতেও অন্ন জুটে যাবে,—বলতে পারেন আমি এখন কি করি ?

ভবানন্দ আর চুপ করে থাকতে পারলে না। বললে—আপনার শ্বশুর বাড়ীতে ওখানে—

হঠাৎ তীক্ষ্ণ পরুষ কণ্ঠে জয়া হেসে উঠলো। সে হাসি যেন দম্‌কা হাওয়ার মত। বিদ্রূপের আঘাতে সে যেন নিজেকেও ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতে চায়। বললে—মাথায় সিঁদূরের চিহ্নটুকুও নেই, কাল থেকে আপনাদের গেরুয়া থান পরে আছি, তাই বুঝি ঠাট্টা করলেন ? ওসব চুকে গেছে অনেক কাল, তেরো বছর বয়সের আগেই—বুঝলেন না ? আমিও সে সব ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি।

তা হলে কি করবেন ?

করবার মধ্যে এখন দেশে ফিরে যাবো। তারপর কপাল সঙ্গে যাবে। ঝি-গিরিও কর্ত্তে পারি, পরের বাড়ীতে রাঁধতেও পারি, আর সুবিধে যদি পাই তাহলে—

শেষ পর্য্যন্ত তাই ঠিক হলো। কোনো রকমে দেশে তাকে পাঠিয়ে দিতে হবে।

প্রেমানন্দ বললে—পঁচিশ মাইল এখান থেকে পাহাড় উৎরাতে হবে, তারপর মাঠ—তাও প্রায় ছ' কোশ। তা' পর রেল-ইষ্টিশান।

বেশ, আমাকে কেউ মাঠে নামিয়ে দিয়ে আসুন, তারপর আমি নিজেই যেতে পারবো। টাকা কড়ি ত আমার কিছুই নেই ?

ভবানন্দ বললে—সে আমরা ঠিক করে দেবো। আমাদের আশ্রমের 'ফাণ্ড' আছে।

আড়ালে ডেকে পরম আগ্রহভরে প্রেমানন্দ বললে—এতটা রাস্তা, সঙ্গে করে' কে ওঁকে নিয়ে যাবে?

একটি রাত্রে ভবানন্দ যেন বদ্‌লে গেছে। স্পষ্টই বললে—তোমার যাওয়া চলতে পারে না। ঘণ্টা কয়েক লাগবে, আমিই ওঁকে মাঠে নামিয়ে দিয়ে চলে' আসবো।

লজ্জায় অপমানে ধিক্কারে প্রেমানন্দর মুখখানা একেবারে কালো হয়ে এল। কোনো রকমে কি একটা উত্তর দিয়ে সে আড়ালে চলে' গেল।

যাবার সময় শুধু বললে—এই দুটি দিনের কথা হয় ত চিরকাল একটু একটু করে' মনে করবো।

তার বেদনাহত মুখখানার দিকে চেয়ে জয়া কি ভাবলে। পরে বললে—সন্ন্যাসীর মুখে ত এ কথা মানায় না ভাই?

মুখ ঢেকে প্রেমানন্দ তখন পালাবার পথ খুঁজছে।

উঁচু পাহাড় সমতল ভূমিতে এসে ক্রমশঃ মিশে যায়। হাওয়া-গাড়ী ওধারে আর যায় না। দুজনে নামলো।

দুধারে ছোট ছোট গাঁ। পাহাড়ের জটিল পথ তখনও শেষ হয়নি। দূরে দূরে গোরা-সৈন্যের 'ক্যাম্প' দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট সরাইখানা। দোকান-পাতি। ছোট লিক্‌লিকে নদীটি শুকিয়ে গেছে, পাথরের নুড়ির তলায় তলায় শুধু প্রাণটুকু

ধুক্‌ধুক্‌ করছে। অনুর্ব্বর পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাখীর দল উড়ে উড়ে বসছে।

এবার কোন্ দিকে স্বামিজী? আপনিই ত এখন আমার—বাকি কথাটা শেষ না করেই জয়া হাসলে।

জয়ার মুখখানি রাঙা। রোদ লেগেছে। পথের কষ্টটুকু তার মুখের ওপর যেন একটি মধুর রূপ নিয়েছে।

ভবানন্দ বললে—এবার একটু হাঁটতে হবে। খানিক গিয়ে আবার হাওয়া গাড়ীতে উঠবো।

দুজনে তখন পথ হাঁটতে থাকে। প্রয়োজনের কথা ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু চুপ করে' থাকা জয়ার ধাতে লেখেনি। বললে—পথে এসে আপনার তবু মুখ ফুটলো; ছোট স্বামীজি থাকতে ত একেবারে বোবা মেরে গিয়েছিলেন!

ভবানন্দ শুধু হাসলে।

আপনি নেহাৎ রুক্ষও নন্। সেদিন বেহালার বাজ্‌না শুনে আপনার মনটা যেন দুলে উঠেছিল মনে আছে। আমার ওপর কাল থেকে আপনি রেগে আছেন কেন?

ব্যস্ত হয়ে ভবানন্দ বললে—না না, রাগ কি! আমরা কারো ওপর রাগতে পারি না।

সরাইখানার পাশ ঘেঁসে চলছিল। লোকজন পিছন থেকে চেয়ে আছে। জয়া হঠাৎ বললে—ওরা কি মনে কচ্ছে বলুন ত?

মুখ ফিরিয়ে ভবানন্দ বললে—কেন?

আশ্চয্যি, আপনি আবার বলছেন, কেন? উপবাস

করে' করে' আপনারা বুদ্ধিটাকেও হজম করে' ফেলেছেন দেখছি।

ওঃ সেই কথা! তা লোকে মনে করলে আমাদের ত কোনো ক্ষতি নেই!—ভবানন্দ বললে।

তার মানে আমাদের পথে আমরা ঠিক চলবো—এই না?—জয়া হেসে উঠলো।

এ হাসি যে ভাল লাগে না তা নয়, কিন্তু শুনলে সত্যিই ভয় করে। ভবানন্দ সবিস্ময়ে একবার তার মুখের দিকে তাকায়। এই দিশাহীন পথযাত্রার তীরে চলতে চলতে এমন করে যে হাসতে পারে, সে হয় সংসারের সকল উদ্বেগের ওপর, নয় ত এ দুনিয়ায় কিছুই সে গ্রাহ্য করে না। ধর্ম্ম সমাজ জীবন মরণ সবই যেন তার কাছে বিদ্রূপের বস্তু।

ভবানন্দ বললে—আমার আসবার বোধ হয় দরকার ছিল না, আপনি একাই চলে' আসতে পারতেন।

এসেছেন যখন, তখন সে কথা আর শুনে কি হবে!

ঘন জঙ্গলের সীমানাটা পার হয়ে ভবানন্দ বললে—ওই লাঙ-পটীর পাকা রাস্তা দেখা যাচ্ছে, ওইখান দিয়ে গাড়ী যাবে। আমার আর বেশিদূর যাবার দরকার হবে না।

হাসি জয়ার মুখে থেমে গিয়েছিল। কি ভেবে মুখ তুলে বললে—একলা আমাকে এতদূর যেতে হবে, তাই ভাবচি।

সে ত' আপনাকে যেতেই হবে।

আচ্ছা, মেয়েছেলেকে একলা রাস্তায় ফেলে রেখে চলে যেতে আপনার ভাল লাগে ?

সেই হেঁয়ালী! মাথার ভিতর যেন গোলমাল লেগে যায়। ভবানন্দ বলে—আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারি না।

এবার জয়া হেসে বলে—আপনাকে ছেড়ে দিতে মন সরচে না—এবার বুঝতে পেরেছেন? আর একটু সঙ্গে চলুন। কি আশ্চয্যি, আমি ত' আর ডাকাত নই যে অর্দ্ধেক রাস্তায় আপনার গলা টিপে মারবো। এত বড় জোয়ান লোক হয়ে আপনি সামান্য একটা তেইশ-চব্বিশ বছরের মেয়ের সঙ্গে পথ চলতে ভয় পাচ্ছেন? সন্ন্যাসীরা যে বাঘ ভল্লুককেও ডরায় না!

পাকা রাস্তা পর্য্যন্তই ভবানন্দকে আসতে হয়। বেলা পড়ে এসেছে। মাঠের হাওয়ায় শীত ধরে।

দূরে হাওয়া-গাড়ী দেখা যায়। ভবানন্দ বলে—অনেকটা চড়াই ভেঙে আমায় ফিরে যেতে হবে। এবার তা হলে—

মুখের ওপর হেসে জয়া বলে—তাহলে বিদায় নয়! আপনাকে সঙ্গে যেতেই হবে—অন্তত ইষ্টিশান পর্য্যন্ত।

দেখুন, কিন্তু—প্রেমানন্দ কি মনে কচ্ছে, এখুনি আমার ফিরে যাবার কথা।

গাড়ী এসে দাঁড়ায়। জয়া বলে—বেশ ত, তাই যাবেন। এখন গাড়ীতে উঠুন চট্ করে', দেরি করবেন না।

এর পর কোনো কথাই চলতে পারে না। শান্ত ছেলেটির মত ভবানন্দ গাড়ীতে ওঠে; জয়াও ওঠে পিছনে পিছনে।

পাশাপাশি দুজনে বসে। কম্বলটা এবার জয়া গায়ের ওপর ভালো করে জড়িয়ে নেয়। অন্যান্য যাত্রীরা সবিস্ময়ে তার দি:ক এক একবার তাকায়।

অনেক রাস্তা। ফাঁকা মাঠ দিয়ে ছুটতে থাকে। মাঝে মাঝে ঝাঁকানি দেয়। দুজনের গায়ে গা ঠেকে। কয়েক দিনের ক্লান্তিতে জয়ার দীর্ঘায়ত কালো:কালো চোখ আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। গাড়ীর দোলনায় তন্দ্রা আসে।

মাঠের ওপারে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। ন সূর্য্যাস্ত ভবানন্দর চোখে আর কোনোদিন পড়েনি। চারিদিকে আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। সে আরক্ত আভাস পড়েছে জয়ার গ্রীবায়, এলো খোঁপার অসংলগ্ন চুলের গোছায়, তন্দ্রাচ্ছন্ন মুখখানির ওপর, অনাবৃত বাঁ হাতখানিতেও। জয়া যেন তার জীবনে একটি বিস্ময়—সৌন্দর্য্যের একটি প্রদীপ যেন তার জীবনের তীরে জ্বালিয়ে রেখে গেল!

এঃ, চেয়ে আছে দেখো হাঁ করে, মুখ োরাও ওদিকে।

গলার আওয়াজে জয়া জেগে উঠলো। বললে—ও হরি, আপনার গায়ের ওপরেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!—কি হলো কি?

চেয়ে আছে দেখুন না ড্যাব ড্যাব করে,—অসভ্য!

ভালো হয়ে বসে জয়া বললে—অসভ্য, কিন্তু অন্যায় নয়! দৃশ্যটি দেখবারই মতন। ভেতরের কথা যারা জানে না তারা বলবে, একটা মেয়ে একটা সন্ন্যাসীকে নিয়ে পালাচ্ছে, সন্ন্যাসীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

জয়া হেসে উঠলো। তার সমস্ত রূপ, সমস্ত যৌবনও যেন তার সঙ্গে হাসতে লাগলো।

ভবানন্দ বললে—এ কথা যারা ভাবে তারা নিতান্তই জানোয়ার!

জনহীন মাঠের মাঝখান দিয়ে গাড়ী তখন এগিয়ে চলেছে।

পথ ফুরিয়ে গেল। ইষ্টিশানে দুজনে নেমে জানতে পারলো, একটু আগে গাড়ী ছেড়ে গেছে। আবার গাড়ী আসবে ঘণ্টা দুয়েক পরে। জয়া একপাশে গিয়ে বসলো। ভবানন্দ বললে—টিকিট করে' আনি।—বলে সে চলে গেল।

ইষ্টিশানে তখন চারিদিকে আলো জলে উঠেছে। লোকজনের ভিড় বিশেষ নেই, টিম্‌টিম্‌ করছে। সম্প্রতি হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হওয়ায় কয়েকজন পুলিশ নতুন চাকরি পেয়ে ঘোরাফেরা করছে। জয়া থামের আড়ালে গিয়ে মুড়ি সুড়ি দিয়ে বসলো।

ভবানন্দ খানিকক্ষণ পরে এসে বললে—এখানে বসে রয়েছেন? আমি তখন থেকে খোঁজাখুঁজি করছি। এই টিকিট নিন্‌। আজকের রাত আমাকে পথেই থাকতে হবে দেখছি। দিনের আলো নৈলে সে পথে যাওয়া চলতে পারে না। যাই হোক, আপনার একটা কিনারা ত হল! নিন্‌—টিকিট ধরুন।

কথাও কয় না, উত্তরও দেয় না—মুখও তোলে না। ভবানন্দ আবার বললে—শুন্‌চেন? টিকিটখানা ভালো করে রেখে দিন্‌। কি হলো আপনার?

অবরুদ্ধ অশ্রুর চাপে জয়া এবার ফুলে ফুলে উঠলো। মুখ না তুলেই চোখের জল মুছতে লাগলো। ধরা গলায় বললে—টিকিট ত দিচ্ছেন। মেয়েমানুষ হয়ে কোথায় আমি যাবো? পথে ভয় নেই?—চোখের জল তার আবার গালের ওপর গড়িয়ে এল।

নারীর অশ্রু! সুন্দরীর অশ্রু! যুবতীর!

ভবানন্দ সেখান থেকে সরে গেল! কোথায়—কোনো ঠিক নেই। স্খলিত পদে সে এখানে ওখানে ঘোরাফেরা করতে লাগলো। দূরের অন্ধকার আকাশ আজ যেন তারও চক্ষে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। সেও যেন আজ অশ্রুর মধ্যে, ব্যাথার মধ্যে কি কথাটি বলতে চায়।

একটু পরেই হুস্ হুস্ শব্দে গাড়ী এসে দাঁড়ালো। আর বিবেচনা করবার সময়ও নেই। ভবানন্দ আবার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে—এমন করে কাঁদলে আমি কি করতে পারি বলুন?

জয়া ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। বললে—করবার কিই বা আছে! দিন্ টিকিট দিন্। যেমন করেই হোক ঠিক যাবো। এ ত' আর মগের মুলুক নয়!

টিকিটখানি নিয়ে সে আঁচলে বাঁধলে। একটু আগে চোখের জল ফেলে মুখখানি তখন তার ভারি হয়ে উঠেছে। বললে—গাড়ী বোধ হয় বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না, কম্বলখানা একবার ধরুন চট্ করে,' কাপড়খানা ভাল করে পরে নিই।

দ্বিধাসঙ্কোচ কিছুই এ মেয়ে মানে না। কিন্তু এর লজ্জা-হীনতা ইতরতার নামান্তর নয়,—এ সমস্ত নিতান্তই যেন এর পক্ষে স্বাভাবিক।

কপাড় পরে' কম্বলটা পুনরায় গায়ে জড়িয়ে হেঁট হয়ে একটি ছোট নমস্কার করে' জয়া উঠে দাঁড়ালো। বললে—অনেক কষ্ট দিয়ে গেলাম আপনাদের,—আসি তবে।

গাড়ী তখন ছাড়ে আর কি! ভবানন্দর মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না। সে তখন সত্যই মাতাল হয়ে উঠেছে। পা টল্‌ছে। ক্ষুধাতুর জানোয়ারের মত চোখ দুটো অকারণে দপ্ দপ্ কচ্ছিল। এই অগ্নিময়ী [illegible]র দিকে তাকিয়ে মুহূর্ত্ত-কালের মধ্যে তার ইহকাল পরকাল যেন শিথিল হয়ে এল।

শুধু বললে—আচ্ছা।

জয়া গাড়ীতে উঠে গিয়ে বস্‌ল। তখন গার্ডের বাঁশী বাজছে।

ডাকগাড়ী ঘন ঘন দাঁড়ায় না। ছুটছে ত ছুটছেই। জানালার কাছে চুপ করে জয়া বসে রইলো। সে যেন মরিয়া। নিরুদ্দিষ্ট পথে চললো। কোন্ জাতীয় বিপদ ঘটবে কে জানে! না আছে টাকাকড়ি, না গহনাগাঁটি—তবু মেয়েমানুষের আর একটা ভয় আছে বৈ কি! বিশেষ তা'র!

জয়া চেপে-চুপে মুড়ি-সুড়ি দিয়ে বসে রইলো। বাইরে চাঁদ্‌নি রাত। আকাশ পরিষ্কার। তারা ফট্ ফট্ কচ্ছে। খাল বিলের

ওপর চাঁদের আলো পড়ে মাঝে মাঝে ঝক্ ঝক্ করে উঠছে। দূরে পাহাড় প্রান্তর বনশ্রেণী, ছোট ছোট গ্রাম, লোকালয়ের প্রদীপ-চিহ্ন—সমস্তই একে একে উল্টোদিকে ছুটে চলছে। জয়া ভাবছিল, এ জ্যোৎস্না রাত যেন না পোহায়, এ পথ যেন আর শেষ না হয়!

বড় একটা ইষ্টিশানে এসে গাড়ী থামলো। জয়ার হুঁস নেই, একদৃষ্টে একদিকে চেয়ে ছিল। চোখের মধ্যে সে যেন জ্যোৎস্না-ময়ী আকাশকে ধরে এনেছে।

শুনচেন ?

জয়া চমকে উঠে মুখ ফেরালে।—এ কি, স্বামীজি! আপনি যান্‌নি তখন? সঙ্গে সঙ্গে এলেন বুঝি?

ভবানন্দ বললে—কি করি বলুন। এ অবস্থায় আপনাকে ছেড়ে দিয়ে—

তা ত সত্যি! হাজার হোক মানুষের মন ত! আসুন—ওপরে উঠে আসুন, গাড়ী হয়ত ছেড়ে দেবে এখুনি।

ভবানন্দ উঠে এসে সুমুখের বেঞ্চিতে বসলো। গাড়ীর মধ্যে তিন চারজন মাত্র লোক ছিল। তাদের দিকে চেয়ে হঠাৎ সে বললে—এখানেও তাই। বেটারা ফ্যাল ফ্যাল্ করে চেয়ে আছে দেখুন না!—ইতর কোথাকার!

জয়া হেসে বললে—ওটা পুরুষ মানুষের স্বভাব মেয়েরাও কি দেখতে ছাড়ে! ঘোম্‌টার ফাঁক দিয়ে দেখে বলে তারা আরো বেশি দেখতে পায়।

ভবানন্দ বললে—আশ্রমের ওরা কি ভাবচে কে জানে!

জয়া হেসে বললে—কি যে ভাবচে তা হয় ত আমরা দুজনেই বুঝতে পাচ্ছি—কি বলুন?

তার উজ্জ্বল নিদ্রালস চোখ দুটির দিকে চেয়ে ভবানন্দ বললে—আপনাকে একা পথে ছেড়ে দিয়ে চলে' যাওয়া কিন্তু অন্যায় হতো। আপনি এতক্ষণ কি ভাবছিলেন?

কিছুই না।—জয়া বললে—রাত্রি বেলাকার আকাশের দিকে চেয়েছিলাম, চোখে হয় ত জল আসছিলো।—পরের ইষ্টিশানে নেমে আপনি চলে যান্। এমন করে' কতদূরই বা যাবেন আমার সঙ্গে?

ফিরতে ত হবেই। আপনার একটা কিনারা না করে দিয়ে যদি,—মাঝখানে আবার এক জায়গায় গাড়ী বদল কর্ত্তে হবে।

জয়া অন্য দিকে ফিরে হেসে বললে—প্রথম দিন আপনার ব্যবহার দেখে মনে হয়েছিল আপনি খাঁটি সন্নিসি, কিন্তু আজ দেখছি আপনি সত্যিই আমাকে—আবার হেসে বললে—সত্যিই আমাকে স্নেহ করেন!

কোনো কথাই আর ভবানন্দর কানে যায় না। সে এ সব ছাড়িয়ে গেছে। বললে—জায়গা এখানে অনেক আছে, ঘুমুতে পারবেন। বসুন, কিছু খাবার কিনে আনি।

কিন্তু ট্রেন ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে।

সমস্ত রাত গাড়ী চলতে থাকে। মাঝে মাঝে থামে। আবার চলে। জয়া ঘুমিয়েছে। নিদ্রিত মুখখানিতে না আছে উদ্বেগ,

না আছে চিন্তার রেখা। মাথার চুলগুলি গাড়ীর আলোয় চক্‌চক্‌ করছে। টানা টানা কালো দুটি ভুরু, কালো দুটি আঁখিপল্লব—নিদ্রার তীরে যেন ধ্যানে বসেছে। পাত্‌লা দুখানি ঠোঁট কমল-কলিকার মত মাঝে মাঝে কাঁপছে।

সেই দিকে চেয়ে ভবানন্দ চুপ করে' বসে রইলো। রাত পুইয়ে কখন্‌ সকাল হয়ে গেছে কিন্তু তার দেখা আর শেষ হয় না।

জয়া জেগে উঠে বসলো। রোদ উঠেছে। দিনের আলো যেন আনন্দের রূপ নিয়ে এল। বললে—খুব ঘুমিয়েছি, আপনি সঙ্গে না থাকলে হয় ত এত ভালো ঘুম হতো না।

ভবানন্দ বললে—এর পরের ইষ্টিশানে গাড়ী বদ্‌লাতে হবে।

ও। আপনি বোধ হয় সেই গাড়ীতে আমায় তুলে দিয়ে ফিরে যাবেন?

একটু অসহিষ্ণু হয়ে ভবানন্দ বললে—ও কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না।

জয়া চুপ করে রইলো। খানিক পরে ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে বললে—এ কিন্তু আপনার পক্ষে ভাল কথা নয়!

ভবানন্দ অন্য দিকে মুখ ফেরালো।

যাই হোক—পরের ইষ্টিশান কিন্তু এল অনেক দেরিতে। বেলাও তখন অনেক হয়ে গেছে। গাড়ী থেকে নেমে জয়া 'প্রতীক্ষা-গৃহে' গিয়ে মুখে চোখে জল দিল। ভবানন্দ খাবার আনলো।

গাড়ী আসতে কিছু বিলম্বই ছিল। জয়া বাইরের বেঞ্চিতে এসে বসে রইলো।

ভবানন্দ এমনি পায়চারি কচ্ছিল।

আরে সুরেশদা যে! বহুকাল পরে,—বলি এদিকে কোথায়?

ভবানন্দ চট্ করে ঘাড় ফেরালে। মুখে আর হাসি আসে না। বললে—অবনী যে, খবর কি?

খবর এক রকম। তুমি যে একেবারে সন্ন্যাসীই হয়ে গেছ সুরেশদা? কবে থেকে এ রকম মতিগতি হল? বেশ—বেশ, মাথাটি নেড়া, পরণে গেরুয়া, খালি পা! বলি নেশাটেশা গুলো ছেড়ে দিয়েছ?

আঃ, কি হচ্ছে? চুপ কর! লোকে মনে করবে কি?

হো হো করে অবনী একচোট হেসে নিল। বললে—সুযোগ ছাড়তে পারিনে সুরেশদা,—আরে, উনি কে! বাঙালীর মেয়ে মনে হচ্ছে যেন!

উনি আমার সঙ্গেই আসচেন।

তাই নাকি! বিয়ে করেছ তা হলে? গেরুয়াই বরবেশ! বা রে সুরেশদা,—দাঁড়াও, বৌদিকে প্রণাম সেরে আসি।

থামো থামো,—তুমি ভারি ছট্‌ফটে। পৃথিবীতে সকলেই তোমার দিদি-বৌদিদি নয়।

মাঝপথে থেমে অবনী বললে—কে তা হলে? কোনো আত্মীয়, কিম্বা—

ভবানন্দর তখন আর মাথার ঠিক নেই। বললে—কেউই নয়!

অবনী বেচারার হাসি বন্ধ হয়ে গেল। চুপি চুপি বললে—সে সব রোগ তোমার এখনও যায় নি? তা আর কি করা যায়। যাই হোক—আমার কাছে এক আধ দিন থেকে যাও? অনেক দিন বাদে দেখা হয়ে গেল!

ভবানন্দ বললে—তুমি যা মনে করছ তা নয় অবনী।—বলে সে জয়ার কাহিনী একে একে বলতে লাগলো।

অবনী সব শুনে হেসে বললে—সরস পরোপকার! যাই হোক, ডাইনের হাতে ছেলে থাকা ভাল নয়। চল, এখন আমায় একটু অতিথি সৎকার করতে দাও। কি বল?

তার সঙ্গে পথে এমন ভাবে দেখা হওয়াটা ভবানন্দর ভাল লাগলো না। বললে—থাকগে, অত ঝঞ্ঝাটে আর দরকার নেই অবনী, যা হোক করে আমরা—

একটা দিন বিশ্রাম নিতে পারতে!

ভবানন্দ কি ভেবে বললে—বিশ্রাম ত গাড়ীর মধ্যে হচ্ছেই, তা ছাড়া—

এবার জয়া উঠে এল। ভবানন্দ মহা আপত্তি জানিয়ে বললে—আপনি বসুন গে ওখানে, আমি একটি বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছি। অনেক দিন বাদে এঁর সঙ্গে—

তা ত দেখতেই পাচ্ছি। তা বলে বন্ধুত্ব করাটা আপনার একচেটে নয়। উনি আমারও বন্ধু হতে পারেন। পরে অবনীর দিকে চেয়ে ছোট্ট একটি নমস্কার করে জয়া বললে—বৌদি বলে ভুল করেছিলেন বটে, তা বলে প্রণাম করলে বোধ হয় অন্যায়

হতো না, কারণ আমি বামুনের মেয়ে এবং বয়সেও বোধ হয়—

অবনী তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে প্রণাম করলে। পরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলো—ঠিক বলেছেন, আপনি আমার দিদির মতন। কিন্তু তা নয়, আমি সে জন্যে—

ভবানন্দ আর চুপ করে থাকতে পারলে না। বললে—উনি বলচেন, ওঁর বাড়ীতে আজ আমরা অতিথি হই। আমার তাতে ইচ্ছে নেই, কারণ—

আপনার ইচ্ছে নেই কিন্তু আমার আছে। এক আধদিনের জন্যে আমাকে জায়গা দেবেন অবনীবাবু? ভয় নেই, আমার দ্বারা কোনো বিপদ ঘটবে না আপনার।

কি আশ্চর্য্য, এ আমার সৌভাগ্য যে আপনার মতন লোক,—

ভবানন্দ মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল। জয়া তাকে লক্ষ্য করে বললে—সন্ন্যাসীর শিষ্যা হয়ে ঘোরাঘুরির চেয়ে এক আধদিন ছোট ভাইয়ের দিদি হওয়া ভাল! আপনার সুরেশদাকে বলুন, উনি বোধ হয় লজ্জিত হচ্ছেন।

অত্যন্ত রুক্ষস্বরে ভবানন্দ বললে—পথে এসে এমন আমার অবাধ্য হবার কথা ছিল না আপনার সঙ্গে!

তার মানে? আপনি কোন্ জাতের বাধ্য-বাধকতা চান্ আমার কাছে?

আমি? কি চাই? কিছুই না! আপনাকে একটা নিরাপদ জায়গায় রেখে চলে যেতাম—এই পর্য্যন্ত!

এবং তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো বেচারা অবনীর ওপর। বললে—তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ অবনী, এতটুকু বুদ্ধি নেই—এ রকম অবস্থায় অতিথি সৎকার না করলে কি আর তোমার চলছিল না?

অবনী বললে—দোহাই সুরেশদা, এক[illegible] প্রসন্ন হও। আজ সাগরের তীরে চলতে চলতে হঠাৎ রত্ন কু[illegible]য়ে পেয়েছি,—ভাল করে একটু—আসুন আমার সঙ্গে।—তুমি এসো ভাই সুরেশদা।

জয়া হাসতে হাসতে তার পাশে পাশে চললো।

পিছনে পিছনে চলতে লাগলো বটে কিন্তু ভবানন্দর মুখখানা তখন রোষে, ক্ষোভে, হিংসায় একেবারে জর্জ্জরিত হয়ে উঠেছে।

পাশাপাশি তিন চারিটি ঘর—পরিষ্কার তক্তকে। সুমুখে বেতের বেড়া দেওয়া একটুখানি বাগান,—গোলাপের চারা, রজনীগন্ধা আর সূর্য্যমুখী মিতালি পাতিয়ে আছে।

ইষ্টিশানে কাজ করে। রাতে মাঝে মাঝে 'ডিউটি' পড়ে। ছেলেটির জীবনে এইটুকুই শুধু বাঁধন। অবসর সময় ভালো ভালো বই পড়ে। মাসিক পত্রে কবিতাও লেখে।

যেন অনেক কালের আত্মীয়তা।—

দেখছেন এইটি আমার পড়বার ঘর, ওটা [illegible]কখানা,—আর ওই যে ও-ঘরটি দেখছেন ওর জানলায় বসলে নদীর কিনারাটি দেখা যায়—সমস্ত আকাশটুকুও! আমি এমনি ভালবাসি—

বুঝলেন? আর ওই দেখুন ফুলের বাগান ওদিকে—ওই দিকেই সূর্য্য অস্ত যায়। এবারে একটা বকুলের চারা দেবো ভাবচি।

'তুমি' বলাটা জয়াই প্রথমে সুরু করে। বলে—বিয়ে করনি কেন ভাই?

বিয়ে!—অবনীর মুখটি লাল হয়ে ওঠে। বলে—আজ্ঞে না!

শিশুর মত চোখ দুটি সরল—ভাসা ভাসা। চওড়া কপালে আজ অবধি মনে হয় সংসারের কোনো রেখাপাতই হয়নি।

জয়া আর কিছু বলে না। তার কথা যেন ফুরিয়ে গেছে। উদাসিনী বিধুরার মত সে খানিকক্ষণ ঘরগুলির মধ্যে পায়চারি করে বেড়ায়। অকারণে তার হৃদয়খানি উদ্বেল হয়ে ওঠে। মনে হয় পৃথিবীতে শুধু যেন তারই কোনো দাবি-দাওয়া নেই!

ভবানন্দ তাদের লক্ষ্য করে। কাণ পেতে দুজনের কথা শোনে। ঈর্ষায় তার সর্ব্বাঙ্গ রি রি করে।

হাল্কা পাখায় অবনী যেন উড়ে বেড়ায়—ধরিত্রীর উপবনে ছোট ছোট পাখীর মত।

বলে—দিদি, আমার শুক্‌নো নদীতে বান ডেকে গেল। তুমি আমার জীবনের সঞ্চয়।

জয়া বলে—বানটা থাকবে বোধ হয় চব্বিশ ঘণ্টা, কোটাল গেলেই সরে' যাবে। তুমি যে রকম যত্নটি আরম্ভ করেছ, তোমার সঞ্চয়টুকু ডাকাতি না হলে বাঁচি।—জয়া এইবা'র খিল্ খিল্ করে হাসে।

জয়া যেন তার অনেকখানি। জয়া যেন প্রথম সন্ধ্যাতারা,

যেন জীবনের জ্যোৎস্না—জয়া যেন পৃথিবীর কোহিনূর। জয়া দিদি!

অবনী বলে—দিদি, তুমি থাকবে না ভেবে চোখে জল আসছে, সত্যিই কি কাল চলে যাবে?

জয়া বলে—যদি না যাই?

যাবে না? তুমি যে যাবে না এ কথাও আমি ভাবতে পারি না। তুমি যাবেই। তোমার ঘর আছে, সংসার আছে, তোমার দায়িত্ব আছে—

বাইরের অন্ধকারের দিকে জয়া হঠাৎ মুখ ফেরায়। চোখে তার জল আসে। মনে হয় সে যেন ঝরা পাতা—যেন মাটির ঢেলা সে!

ভবানন্দ এসে ঘরে ঢোকে। এদের একলা রেখে সে যেন বাইরে থাকতেই পারে না। বলে—কাল সকালের গাড়ী, খেয়ে দেয়ে যেতে বোধ হয় আর সময়ই পাওয়া যাবে না। ঘুম থেকে উঠেই—

অবনী বলে—সুরেশদা, তোমাকে দেখলেই আমার ভয় করে—কেন বল ত? এতদিনের পর দিদিটিকে পেলাম, কিন্তু ভাই তুমি তাকে—

জয়া মুখ ফিরিয়ে বলে—ভয় পাওয়া অন্যায় নয়। ভবানন্দর ছদ্মবেশে ওঁকে মানায় না। কি বলুন স্বামীজি?

স্বামিজী বলে—আপনার কথা সব সময় বোঝবার জো নেই। যাই হোক, কাল সময় থাকতে তৈরী হয়ে নেবেন।—বলে সে বাইরে চলে যায়।

তার পথের দিকে চেয়ে জয়া বলে—সময়ের ত অভাব নেই, গাড়ীও সব সময় পাওয়া যায়। আপনি পরোপকার করতে অত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন?

কোনো সাড়া আসে না। জয়া বলে—উনি বোধ হয় আমার উপকার না করে' আর ফিরবেন না।

দুইজনেই হেসে ওঠে। সে হাসি ঘর দোর ছাড়িয়ে বাইরে পর্য্যন্ত শোনা যায়।

অবনী বলে—সুরেশদা রেগে গেছে আমার ওপর।

রাত্রি ক্রমশ ভারি হয়ে আসে। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। অবনী শোবার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বলে—সুরেশ দা, এ ঘরে বেশ হাওয়া আছে, আলো জালিয়ে দিলাম—

ভবানন্দ বলে—আমার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই। তোমার দিদিটিকে এইবার ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমুতে বলো। অসুখ বিসুক হলে তখন আমাকেই—

অবনী এসে বলে—শুতে যাও দিদি তোমার ঘুমোবার আদেশ হয়েছে—

দুজনেই আবার হেসে ওঠে। ভাই বোনের সে হাসি সহজে আর থামে না। তারপর গল্প সুরু হয়; নানা আলোচনা,—নানা দেশের কথা। পাশের ঘরে বসে ভবানন্দর কাণে যেন কাঁটা ফোটে। উঠে বাইরে এসে জানালার ফাঁক দিয়ে সে দুজনের দিকে চেয়ে থাকে। চোখ দুটো জ্বলে—নিস্ফল আক্রোশে, ব্যর্থ বিদ্বেষে!

এদিকে তখন উঁচুদরের আলোচনা চলে—

বিয়ে না করাটা মানুষের গৌরব নয় ভাই।

আমার ত কোনো অভাব মনে হয় না দিদি?

বিয়েটা শুধু অভাব পোরাবার জন্যে নয় ভাই, বিয়ে মানে জীবনের আধখানাকে পাওয়া। নৈলে অমিল, ছন্দোপতন—নিজের মধ্যে প্রকাণ্ড বিশৃঙ্খলা!

অবনী হেসে বলে—আমি নিজেই সম্পূর্ণ!

জয়াও প্রথমে হাসে। পরে আবার বলে—না ভাই, বিয়ে না করা হচ্ছে নিয়মের বিদ্রোহ, বিধাতার বিপক্ষে বিদ্রোহ, সৃষ্টির অকল্যাণ!

বলে যাও, থামলে যে?—অবনী আবার হো হো করে হাসে।

জয়াও হেসে বলে—এবার যদি বলি, নিজের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করছ?

অবনী উঠে যেতে যেতে বলে—কি যে বল! ওসব দর্শন শাস্ত্র আমি বিশ্বাস করিনে। বললেই কি আর সত্যি হয়? কিছুতেই না—

নিস্তব্ধ রাত্রি বিদীর্ণ করে জয়া আবার তীক্ষ্ণকণ্ঠে হেসে ওঠে।

পায়ের শব্দ পেয়ে ভবানন্দ নিজের ঘরে তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢোকে। বুকের মধ্যে তার যেন অশান্ত দ্বন্দ্বের ঝড় বইতে থাকে। সমস্ত রাত তার ঘুম আসে না। পিঞ্জরাবদ্ধ হিংস্র শ্বাপদের মত নিশ্বাস ফেলে আর মাঝে মাঝে বাইরে এসে দুজনের ঘরের কাছে পাহারা দেয়।

কিন্তু সকাল বেলা উঠেও জয়ার কোনো গা দেখা যায় না, সকল কাজেই সে যেন ঢিলে দিয়েছে। নিতান্ত অনুগ্রহপ্রার্থীর মত তার অপেক্ষায় ভবানন্দকে বসে থাকতে হয়।

অনেক নীচে নেমে গেছে, নেমে যে গেছে এ কথা নিজেই জানে না। জানলার ফাক দিয়ে জয়াকে দেখতে থাকে,—উদ্দাম যৌবন জয়ার সর্ব্বাঙ্গে টল্‌টল্‌ করে। ভবানন্দর ব্যর্থ রোষ, ক্ষোভ, বিদ্বেষ যা কিছু সমস্তই উপবাসী একটা ক্ষুধিত পশুর লালসায় রূপান্তরিত হয়ে ওঠে।

সকাল বেলা উঠে অবনী বেরিয়েছিল। ফিরে আসতেই ভবানন্দ বললে—এ রকম ব্যবহার ভাল নয় অবনী। তুমি বন্ধু হয়ে—

কেন সুরেশদা?—অবনী অবাক।

ভবানন্দ একটু চাপা গলায় বললে—মেয়েমানুষের বুদ্ধিও নেই, দায়িত্বজ্ঞানও নেই, তাকে দুটো মিষ্টিকথা বলে ভুলিয়ে দেয়া সহজ, —কিন্তু—

অবনী এদিকের ইঙ্গিতগুলো বিশেষ বোঝে না। বললে—কখনই না, কিছুতেই নয় সুরেশদা, পৃথিবীতে কাউকেই ভোলাবার উপায় নেই, তারা এত বোকা নয়।

ওঁর একটা যা হোক হিল্লে করে' দিয়ে আমাকে আবার আশ্রমে ফিরে যেতে হবে জানো ত?

তুমি দেখছি সত্যিই সন্ন্যাসী হয়ে গেছ। দাঁড়াও, একটু কাজ আছে—ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তোমাদের যাবার ব্যবস্থা করে

দিচ্ছি। এগারোটার গাড়ীতে—বলতে বলতে অবনী সরে গেল।

জয়া এল। বললে—আপনি যে সর্ব্বদাই তৈরী হয়ে আছেন দেখছি।

ভবানন্দ বললে—এখন আপনার ওপর নির্ভর করছে। সময়ের বেঠিক আমি করিনে। নিন্, তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে, সময় বড় অল্প। ওখানে গিয়ে আবার টিকিট কাটতে হবে।

আজ যদি না যাওয়া হয়?

বা: সে কি, তা হতে পারে না। আমার ক্রমেই দেরি হয়ে যাচ্ছে। অবনীটা ভারি ছেলেমানুষ, ওর কাছে আসাই অন্যায় হয়েছে।

জয়া বললে—আপনার দেরি যদি হয় ত' চলে যান না?

তাই কি হয়? আপনি বুঝচেন না, আপনার ভালোর জন্যেই বলা, নৈলে আমার আর কি!

সত্যিই আপনার কিছু নয়।—বলে জয়া সরে গেল।

পিছনে পিছনে উঠে গিয়ে ভবানন্দ বললে—আপনার কি যাবার ইচ্ছে নেই এখান থেকে? এসব কিন্তু আমি ভালবাসিনে।

ফিরে দাঁড়িয়ে জয়া বললে—আপনার ভালবাসা না বাসায় কিছু যায় আসে না জানবেন।

এ রকম ব্যবহার আপনার কাছে আশা করিনি।

সে আমি জানি। এখন আপনি ফিরে গেলেই আমি বাঁচি। আমার কপালে যাই থাকুক।

ভবানন্দর মনে হল, এ মেয়েকে ভোলানো ও যায় না, কড়া কথা বলে এর ওপর শাসনও চলে না।

বললে—এবার বোধ হয় আপনার পায়ে ধরতে হবে! যদি তাই বলেন আমি তাতেও—

ছি ছি, আপনি না সন্ন্যাসী?—বলে জয়া লজ্জায় ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করে চলে গেল।

অংনী কাগজ কলম নিয়ে কি লিখছিল। জয়া পিছনে দাঁড়িয়ে বললে—তোমার সুরেশদা ভারি অস্থির হয়ে উঠেছেন, আমার যাবার ব্যবস্থাই করে দাও ভাই। তাড়াতাড়ি কি লেখা হচ্ছে? নিশ্চয়ই প্রেমপত্র নয়!

ঠিক ধরেছ দিদি, এটা নিতান্তই ব্যবসায়ী চিঠি!

তোমার মাথায় তা হলে ব্যবসা-বুদ্ধিও আছে?

লোকে তাই ভেবে নিয়েছে। কয়েকজনে আমরা এখানে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছি। সেখানে ছোট ছেলে-মেয়েরা লেখা-পড়াও শিখবে, অন্য কাজও শিখবে। তার জন্যে একটি শিক্ষক দরকার। অতএব খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন লিখে পাঠাচ্ছি।

জয়া বললে—শিক্ষক না হয়ে যদি শিক্ষয়িত্রী হয়?

তাহলে আরো ভালো। কারণ—

কি কি কাজ কর্ত্তে হবে?

এই ধর চরকা কাটা, সেলাই, কার্পেট বোনা, পুতুল গড়া—

মাইনে দেবে—না অমনি?

অবনী এবার হেসে উঠলো। বললে—শুধু মাইনে নয়, আহার এবং বাসস্থান!

জয়া বললে—বেশ! তাহলে আমি এখানেই রইলাম, ও কাজটা আমার চাই! মুখের দিকে চেয়ে আছো যে?

অবনী একেবারে বিহ্বল! বললে—পারবে দিদি তুমি?

মেয়েরা ত শক্তির বড়াই করে না ভাই! কাজ দিলেই বুঝতে পারবে।

অবনীর চোখে ততক্ষণে আনন্দাশ্রু জমে উঠেছে।

জয়া বললে—আর নয়! এবার আমার কাজ রান্নাঘরে। তুমি ভাই একবার বাজারে যাও।—জয়ার যেন নবজন্ম সুরু হলো।

কিন্তু রান্নাঘরে এসে বসে পড়ে সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না, হঠাৎ অপরিমিত আনন্দের আবেগে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললে।

আনন্দ শুধু বেঁচে থাকার, শুধু আত্ম-প্রতিষ্ঠার!

আশাহত, অপমানিত—বিক্ষুব্ধ সাগরের মত! ভবানন্দকে যেন হত্যা করা হয়েছে,—সর্ব্বস্বান্ত করে ধূলায় লুটিয়ে দেওয় হয়েছে। গেরুয়া তার বাধা, গেরুয়া লজ্জা। অবনী তার লুণ্ঠনকারী —দস্যু অবনী!

পতিত সন্ন্যাসী সে; কিন্তু জয়াকে যে চাই। নারীকে যে তার বড় প্রয়োজন!

জয়া আর সুমুখে এল না। বলে পাঠালো, সে থাকবে। সে

আশ্রয় পেয়েছে, ভাই পেয়েছে, তার অন্ন জুটে গেছে। এই গাড়ীতেই স্বামীজি যেন চলে যায়।

ভবানন্দ বেরোলো। মলিন গেরুয়া গায়ে—ছিন্নভিন্ন! পথ যেন আজ বাধা, সন্ন্যাস যেন তার জীবনের গ্লানি! ইচ্ছা হল, আপনার আবরণ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে এই মধ্যাহ্ন সূর্য্যালোকে নিজেকে প্রকাশ করে দেয়। উপবাসী তার আত্মা, বুভুক্ষায় নত-মুখ, লালসায় ক্লিষ্ট—জর্জ্জর!

ইষ্টিশানে গাড়ী এসে দাঁড়ালো; আবার চলে গেল। কোথায় যাবে সে? পথ নাই, নারীর দেহ তার সমস্ত পথ আড়াল করে আছে। নারীর সঙ্গে আজ নরের মত সে ব্যবহার করতে চায়। জয়া তার সকল মন, সকল দিক,—সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে আছে। যে কোনো নারীর মধ্যে জয়াকে তার চাই!

দিন গেল, সন্ধ্যা হল। ভবানন্দ তখনও ঘুরছে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে।

রাত হল'। পাড়ার তখন সব নিশুতি। ভবানন্দ দেখলে, অবনী বেরিয়ে এল, আলো হাতে নিয়ে জয়া এল পিছনে পিছনে। দুজনে রাস্তায় নামলো। বাগানের পাশ দিয়ে চলতে লাগলো।

সেই আদিম নরনারীর মত নিশ্চয় ওরা অভিসারে চলেছে! অবিবাহিত যুবক আর বিধবা নারী।

অবনী বলেছিল, রাতে ডিউটি' পড়ে। মিথ্যা কথা!

অবনী তার জীবনে কলঙ্ক। ব্যর্থ শিকারীর মত ভবানন্দ তখন ক্রোধে প্রতিহিংসায় থর থর করে কাঁপছে।

মনে হল' সে এখনই একটা ভয়ানক চীৎকার করে উঠবে!

মরা রাত্রি—অসাড়। রুগ্না নিশীথিনী পুঞ্জ পুঞ্জ আবিল অন্ধকার উদ্গীর্ণ কচ্ছে। প্রেতিনী অমাবস্যা! কোথায় পেচক ডাকছে বুঝি। গর্ভিনী রাত্রি প্রভাত-শিশুকে জন্ম দেবার আগে যেন প্রসব-ব্যথায় আর্ত্তনাদ করছে।—

খোল খোলো, দরজা খোলো জয়া—শিগ্‌গীর।

জয়ার তন্দ্রা এসেছিল। ধড়মড় করে উঠে বসলো। আলো জ্বলছে।

দরজা খোলো শিগগীর, দরকার আছে।

এ কি, আপনি যাননি এখনও?

দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভবানন্দ বললে—না যাইনি, খোল'।

ভীতা ত্রস্তা জয়া বলে ফেললে—না খুলব না—আপনি যান। —তার পা টলছিল। বললে—আপনাকে আর আমার বিশ্বাস নেই।

খুলবে না? জানলার কাছে ভবানন্দ এসে দাঁড়ালো। মাংস-লোভী ব্যাঘ্রের মত তার চোখ দুটো জ্বলছে।

যে কোনো অন্যায়, যে কোনো পাপ করতেও সে আজ কুন্ঠিত নয়!

জয়া বললে—না, যদি কিছু বলবার থাকে অবনীকে দিয়ে কাল সকালে বলে পাঠাবেন।

আবার অবনী! অবনীর নাম হয় ত তাকে পাগল করে দেবে! ভবানন্দ আবার চলে গেল।

আহত হিংস্র সর্প দংশন করবার আগে যেন ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে।—

জয়ার ঘুম আর এলো না। অবনী বাড়ী নেই। একা সে!

রাত তখন অনেক। কিসের যেন শব্দে জয়া আবার চমকে উঠে বসলো। মনে হল, দিদি বলে একটু আগে যেন কে ডেকেছে! না, কেউ না। অবনী এলে ঘরের কাছে এসেই ডাকত। জয়া আবার বসে বসে ভাবতে লাগলো। কতক্ষণ বাদে মনে হল, কোথা থেকে যেন একটা অস্বাভাবিক গলার আওয়াজ উঠছে। অচেনা জায়গা, বিদেশ; জয়া কি কর্ত্তে পারে! চীৎকার করলেও দূরে কাছে কোথাও সাড়া পাওয়া যাবে না। গভীর রাত্রি আজ যেন ভয়াবহ মূর্ত্তি নিয়ে ক্ষণে ক্ষণে তার চোখে দেখা দিতে লাগলো।

কিন্তু গোঙানির শব্দ মিথ্যা নয়। ক্লিষ্ট, আর্ত্ত, বেদনাহত যেন কার কণ্ঠধ্বনি। জয়া আলোটা বাড়িয়ে দিল। কোনো জানো-য়ার নয়—মানুষেরই আওয়াজ! আলোটা হাতে নিয়ে দোর খুলে সে বাইরে এল। বললে—কে!

নিস্তব্ধ নির্ব্বিকার রাত্রি যেন তার কণ্ঠস্বরে তরঙ্গিত হয়ে উঠলো। কিন্তু পাশেই কোথায় যেন খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে। সাহস করে জয়া সেদিকে এগিয়ে গেল। গিয়ে দেখে—কিন্তু দেখেই সে একেবারে আঁৎকে উঠলো।

হাতের ওপর ভর দিয়ে অবনী ওঠবার চেষ্টা করছে। সর্ব্বাঙ্গ তার রক্তে মাথামাখি। কথা কইতে পারছে না।

আলোটা রেখে ছুটে গিয়ে জয়া তাকে তুলে ধরলো। ভগ্ন কণ্ঠে বললে—কি করে এমন হল, অবনী?

অবনী তখন তার হাতের ওপর নেতিয়ে পড়েছে। তুলে ঘরে নিয়ে এল। বিছানায় শুইয়ে দিল। গেরুয়া চাদর একখানা টাঙানো ছিল,—ঠাকুরের আশ্রম থেকে উপহার পাওয়া,—সেখানা টেনে নিয়ে জয়া অবনীর মুখের রক্ত মুছিয়ে দিল।

নিরপরাধ নিষ্পাপ আত্মার শাস্তি! জীবনে আজও বোধ হয় সে অন্যায় করেনি! জয়ার চোখে জল এল।—

শেষ রাতে জ্ঞান হল বটে। বললে—জানিনে দিদি, অন্ধকারে পেছন দিক থেকে,...প্রকাণ্ড লাঠি! তার পর বোধ হয় আর জ্ঞান ছিল না।

বুকের কাছে অবনীর আহত মাথাটি টেনে নিয়ে জয়া নিঃশব্দে তখন সেই গেরুয়া চাদরখানার দিকে চেয়ে ছিল। রক্তে সেখানা একেবারে মাথামাখি!

আঘাত

একটি বারান্দা, দুটি ঘর, একটুখানি বাগান আর কয়েকটি ফুলের গাছ।

দরজাটি পার হয়ে সরু একটি লাল সুরকির পথ এঁকে বেঁকে উঠে এসেছে বারান্দার কোলে। দুটি ঘরের দরজায় চিক্ টাঙানো। ভিতরের দেয়ালে কৃজিবিশন্ থেকে কেনা কয়েকখানি ভারতীয় চিত্র। মেঝেতে গুটিকয়েক মেহগণি কাঠের আসবাব,—খান তিনেক চেয়ার, একটি ড্রেসিং টেব্‌ল, দুটি টিপয়, একটি বেড-ষ্টোর, আর দুদিকে দুটি বইয়ের র‍্যাক্! আধুনিক' সংস্করণের অনেকগুলি বই আছে বটে!

পাশে একটি বিছানা, পাশাপাশি দুটি বালিশ সাজানো! মাঝামাঝি একটি পাশের বালিশ বিছানাটিকে আধাআধি ভাগ করে' রয়েছে। কড়িকাঠে একটি ইলেকৃট্রিক ফ্যান্ ঘুরছে, 'রেগুলেটরে' গতি একটুখানি কমানো।

জানলার ধারে একখানি ইজি চেয়ারে বসে একটি মেয়ে নিবিষ্ট মনে কি একখানা মাসিক পত্র পড়ছে।

বর্ষার শেষ। মেঘলা আকাশ। একটা জলো ঘোলাটে আবহাওয়া চারিদিক ঘিরে রয়েছে। মনে হচ্ছে কয়েক দিন থেকে শরৎ কালটা প্রবেশ-পত্রের অপেক্ষায় বাইরে অপেক্ষা করছে! আজ সকালে ঘরের মধ্যে শিউলির গন্ধ ঢুকেছিল।

বেলা চারটে!

বাইরে যে পায়ের শব্দ স্পষ্ট হয়ে আসছিল, মেয়েটির হুঁস ছিল না। বাইরের দরজাটা ঠেলে সনৎ এসে ঘরে ঢুকল। কাঁধে একটি বছর দুয়েকের ছোট ছেলে।

মহারাণী?

মেয়েটি একটু হেসে সোজা হয়ে উঠে বস্‌ল। বল্‌ল—কিবা নিবেদন কহ বীরবর!

বীরবর বল্‌ল—সন্তান তব ধূলি-ধূসরিত।—আরে গাধা, কান কাম্‌ড়াচ্ছিস কেন? নাম্‌ তবে। কি দুষ্ট রে বাবা, পিতার সম্মান রক্ষা করে' চলে না!

মেয়েটি উঠে এসে তাকে কোলে তুলে নিল। তারপর চুম্বন করে' বল্‌ল—ত্যজ্যপুত্র হবার ভয় রাখো না?

নেক্‌টাইটা খুলে' সনৎ আন্‌লায় তুলে রাখ্‌ল। ট্রাউজারের ভিতর থেকে সার্টটা টেনে উঠিয়ে তার ওপর টাঙিয়ে দিল। তারপর কাপড় বদ্‌লে সে যখন কাছে এসে হঠাৎ হেসে দাঁড়াল, ছেলেটি তখন আবার তার কোলে আস্‌বার জন্য হাত বাড়িয়েছে।

কোলে তুলে নিয়ে সনৎ তাকে জিজ্ঞেস করল—তোমার মা'র নাম কি বলত' টুটু ?

টুটু তার মা'র দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—মোয়ালানি !

না, না, আর-একটা।

টুটু বল্‌ল—তমচা।

সনৎ বল্‌ল—তমচা নয়, তমসা। গাধা কোথাকার, জিবের এখনও আড়্ ভাঙে নি। আচ্ছা, তা হোক,—টুটু তোমার মাকে বলত' আমার এ বেলার প্রাপ্যটি দিয়ে দিতে !

মাসিক পত্রখানা থেকে মুখ তুলে [illegible]র হেসে ফেলে তমসা বল্‌ল—নিজে ডাকাতি করে' এতদিন পরে বুঝি লজ্জা হচ্ছে ? যাও, ও-সব এখন হবে না !—ঠোট দুটি তার কেঁপে আবার স্থির হয়ে গেল।

একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে [illegible] হেসে বল্‌ল—না, তা নয়, চুমু খাওয়া ছাড়া কি আর আমার অন্য কাজ নেই ? তা বল্‌ছিনে,—ওটা কি পড়া হচ্ছে ? গল্প ? কা'র ?

তমসা ততক্ষণে দস্তুরমত কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠেছে। বল্‌ল—বাজে লেখা ! দেখ না, 'মেয়েটাকে' কি নাস্তানাবুদ করছে।

কি রকম ?

বেশ ছিল...স্বামী আর স্ত্রী ! ঘর-দোর, সাজানো গোছানো, জিনিসপত্র...সুখের সংসার !

তারপর ?

এল এক উড়নচুড়ে দেওর অতিথি-নারায়ণ হয়ে...হতভাগা !

জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করতে স্বরু করে' দিল, ভেঙ্গে চুরে একেবারে তচ্‌নচ্‌! বউটা ত একেই একটু কৃপণ, স্বামীটাও আবার বোকা, ভাইকে ভালবাসে!...ছি ছি, শেষের দিকে একেবারে যাচ্ছে-তাই!

কি শুনি?

বলতে লজ্জা করে। শোনো তবে বলি চুপি চুপি।

কানে কানে তমসা কি বলতেই সনৎ হঠাৎ হো হো করে' হেসে উঠল।

রাগ করে' উত্তেজিত হয়ে আরক্ত মুখে তমসা বল্‌ল—এম্‌নি জঘন্য লোক। এ গল্প যে লিখেছে, আমি তাকে দেখতে পেলে কান মলে দি!

সনৎ বল্‌ল—আমার কিন্তু খুব ভালো লেগেছে।

অ্যাঁ?—তমসা অবাক হয়ে বল্‌ল—এই দুর্নীতি তোমার ভাল লাগে?

সনৎ বল্‌ল—নীতি আমি মানিইনে!

মানো না? আর ধর্ম্ম?

সনৎ একটু হেসে বল্‌ল—আমরা বিংশ শতাব্দীর সন্তান।

তমসা হিন্দুর মেয়ে। যে-বাড়ীতে সে মানুষ হয়েছে, সেখানে আচার-বিচার, পাল-পার্ব্বণ, ঠাকুর-দেবতার পূজা, ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের সেবা—এ সমস্ত নিত্য-নৈমিত্তিক। একদিকে যেমন সাত্ত্বিকতার আবহাওয়া, অন্যদিকে তেমনি সৎশিক্ষার স্নিগ্ধ আলোয় সে বড় হয়ে উঠেছিল।

বিবাহ হয়েছে তার উপযুক্ত স্বামীর সঙ্গে। রাজপুত্রের মত রূপ, উচ্চ আধুনিক শিক্ষায় সুপণ্ডিত, অপরিমিত ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী। বিনয়ী, ভদ্র, বুদ্ধিমান, আত্মপ্রতিষ্ঠ এবং স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত।

ভালবাসা? সমস্ত জীবন তমসার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, আনন্দে, প্রেমে, তৃপ্তিতে, স্বস্তিতে ও গর্ব্বে! ভালবাসায় স্বামী তাকে আবৃত করেছিল, আচ্ছন্ন করে' রেখেছিল।

কাগজখানা ফেলে রেখে সে উঠে দাঁড়াল, পরে কাছে এসে বাঁ হাতটা সনতের কোমরে জড়িয়ে মুখের ওপর মুখ তুলে বল্‌ল— মাঝে মাঝে তুমি এমন কথা বলো যে ভয়ে আমার বুক কেঁপে ওঠে। এমন কথা কি বলে কখনো?

হা-হা-হা করে' সনৎ হেসে উঠল। বল্‌ল—পাগল আর কি! যেটা আমার নেই, সেটা আছে বলে' চালিয়ে দিয়ে লাভ কি?—বলে' দুটি আঙুল দিয়ে সে তমসার চিবুকটি নেড়ে দিল।

বিকাল বেলা এক ঘণ্টার ছুটি নিয়ে 'আয়া'টা চলে গিয়েছিল, এবার সে ফিরে এসে টুটুকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। রান্নাঘরে ঠাকুর এসে রাতের রান্না চড়িয়েছে। ঝি এবার চায়ের জল বসালো।

সুইচ্ টিপ্‌তেই সমস্ত ঘর আলোয় হেসে উঠলো। ফ্যান্-এর বেগটা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে তমসা খাটের ওপর আধ-ভাঙা অবস্থায় উঠে বস্‌লো।

হাসচো যে?

সনৎ বল্‌ল—ভাবছি, আমি যখন থাকিনে, তোমার সময় তখন কেমন করে' কাটে!

তমসা হেসে বল্‌ল—দয়ার শরীর! কিন্তু তোমার হাসি দেখে মনে হয় এ কথা তুমি ভাবছিলে না। তুমি আড় চোখে তাকাচ্ছিলে আমারই দিকে!

আল্‌তা-পরা দুখানি ফর্সা পায়ের ওপর সাড়ীটা তমসা নামিয়ে দিল। মাথার চুলের রাশ আল্‌গা খোঁপায় বাঁধা ছিল, নাড়াচাড়া পেতেই খোঁপার খিল খুলে চুল এলিয়ে পড়ল।

প্রেমের একটি মন্থরতা, একটি গাম্ভীর্য্য এসেছে তাদের জীবনে, দীঘির জল যেখানে গভীর, সেখানে সে অস্থির চঞ্চল নয়, হাওয়া লেগে শুধু একটু একটু কাঁপে; মাতালের উন্মত্ততায় ওলোট-পালোট করে না, সন্ন্যাসীর তপস্যার মত শান্ত!

তমসা বল্‌ল—আমার ঠাকুর-ঘর কেমন করে সাজাচ্ছি, দেখেছ?—বা রে, শুনতে না শুনতেই যে গম্ভীর হয়ে উঠলে!

সনৎ বল্‌ল—তুমি আবার এই ছেলেমানুষীকে প্রশ্রয় দিচ্ছ তমসা!

তমসা চুপ করে রইল। খানিকক্ষণ পরে বল্‌ল—বারেবারে তুমি এটাকে তাচ্ছিল্য কর কেন বল ত? ব্রাহ্মণের ঘর থেকে ঠাকুরের সেবা উঠিয়ে দিলে কি থাকে, শুনি?

সম্পূর্ণ অর্থহীন! নিজেদের মনের উন্নতি যেখানে হল না, বাইরে শিবের মন্দির বসিয়ে সেখানে লাভ কি?—সনৎ একটা সিগারেট ধরালো।

ঝি এসে সুমুখের টিপয়ের ওপর দু' পেয়ালা চা ও রেকাবীতে কিছু জলখাবার রেখে বেরিয়ে গেল।

তমসা বল্‌ল—মনে করো না, এ আমার গোঁড়ামি। এ হচ্ছে গৃহস্থালীরই একটা অঙ্গ। নৈলে ধর, সবই ত হল…স্বামী, সন্তান, ঐশ্বর্য্য, প্রেম, ভদ্রতা, সামাজিকতা—সব! তারপর কি বল দেখি? কি নিয়ে থাকা চলে? আনন্দ, শান্তি, তৃপ্তি না হয় সবই পেলাম একে একে, কিন্তু ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে শুভদৃষ্টি না হলে এরা সবই যে প্রাণহীন! চুপ করলে যে?

সনৎ শুধু বল্‌ল—পাগলামি করো না, ধরো চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নিয়ে তমসা বল্‌ল—তুমি দেখছি নিতান্তই নাস্তিক। মনে করো না যে—

কি শুনি?

হিঁদুয়ানী ত্যাগ করে' বাহাদুরী নিচ্ছ?

তাই নাকি?—এই গরম খাস্তার কচুরিটা খেয়ে ফেল দেখি!
—আরে, থাক্ থাক্, আমার মুখে আর দিতে হবে না!

দাঁত দিয়ে একটু ভেঙে নাও!

প্রসাদ করে' না দিলে খাওয়া হবে না বুঝি?—তমসা আগেকার কথার জের টেনে বল্‌ল—বাড়ীতে ঠাকুর-দেবতার পাট থাকলে সমস্তই সেখানে গিয়ে মেলে। রাশি রাশি ফুল থাকলেও মালা গাঁথা যায় না, সুতো যদি না থাকে।

সনৎ বল্‌ল—আবার?

তমসা হেসে বল্‌ল—এ বিশ্বাস আমার কিছুতেই যাবে না। ধর্ম্মবিশ্বাসই হচ্ছে মানুষের পরম আশ্রয়।

তমসা কোনো কথাই শুনলো না, [illegible]টা তার রইলই। বাড়ীর পাশে যাদের বাড়ী, তাদের মেয়ের সঙ্গে হল তার বন্ধুত্ব। টুটুর পাতানো মাসি। ছাদের পাঁচিলে উঠে একদিন তমসা ডাক পাড়লো—সরলা? শোন্ ত ভাই একবার!

সরলা এল। বল্‌ল—অসময়ে যে? তমসা বল্‌ল—ভালবাসার কি আর সময়-অসময় আছে?—শোন্ বলি, তোদের পুরুৎ ঠাকুর আসবেন কখন্?

এসে ত চলে' গেছেন। তোর ঠাকুর বসবে কবে? নেমন্তন্ন?

হঁ্যা লো হঁ্যা, পরের বাড়ী বিষ পর্য্যন্ত পেলে তুই ছাড়িসনে! —যাই হোক, কাল পুরুত ঠাকুর এলেই কিন্তু আমায় বলিস্ ভাই।

দুই বন্ধুতে পরামর্শ হল'।

সকল খবর রাখবার মত সময় সনতের হতো না। তাকে স্ত্রৈণ বলা যেতে পারে, কিন্তু কুনো বলা চলে না! স্ত্রীই থাকতো তার চোখে সকল সময় জেগে, কিন্তু স্ত্রীকে পার হয়ে যে নিত্য দিনের সংসার, যেটা দম্ দিলে যন্ত্রের মত চলে—সেটার সম্বন্ধে তার চেতনাও নেই, অভিজ্ঞতাও নেই। যা করে তমসা!

এই বাড়ীটা কেনার পর থেকে সিঁড়ির মাথায় যে ঘরটা এতকাল পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল, সেইটিই হল ঠাকুর ঘর। বাড়ীতে শিবের প্রতিষ্ঠা তমসা করবেই!

ঠাকুরের জন্য সোনার সিংহাসনের ফরমাস গেল স্যাকরা-বাড়ী, শয্যা প্রস্তুত হলো, পুষ্পপাত্র প্রমুখ তামার বাসন-কোসন এলো, ধূপধুনো কেনা হল, শাঁখ-ঘণ্টা জমা হল,—তমসা পেলো মনের মত একটি কাজ।

দিনের যে সময়টা সনৎ নিয়মিত বাড়ীতে থাকে না, সেই অবসরেই হয় এই সকল ব্যবস্থা। স্বামীকে একটু চমক দেবার ইচ্ছায় তমসা অতি কষ্টে এমন ব্যাপারটা মুখ টিপে চেপে রইল।

সরলাদের পুরোহিত একদিন এলেন। রাঙা পাড় তসরের শাড়ী পরে' গলায় আঁচল দিয়ে তমসা তাঁর পায়ের কাছে প্রণাম করল।

ভট্‌চায্যি মশায় বললেন—শিব এনেছি মা, কৈ তোমার ঠাকুর-ঘর ?

তাড়াতাড়ি উঠে তমসা ঠাকুরের কাছে এসে দাঁড়াল! বাণেশ্বর শিবটি সিংহাসনের ওপর বসিয়ে ভট্‌চায্যি মশায় প্রথম পূজা সেদিন নিজের হাতেই সারলেন।

দিন যায়। তমসা পূজা করে। ঠাকুরের ভোগ দেয়।

সেদিন কি একটা ছুটির বার। তমসা তার স্বামীকে বল্‌ল—এসো, দেখবে এসো।

সনৎ বল্‌ল—কি ?

তমসা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্‌ল.—প্রিয়তমার পাগলামি!

ঠাকুর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সনৎ পরম বিস্ময়ে হেসে উঠল—অদ্ভুত মেয়ে ত তুমি, আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে এত কাণ্ড করেছ?

আত্মপ্রসাদে তমসার বুক ভরে' উঠল।

সনৎ শুধু হাসতেই লাগল। দেবতা বলে' তার কোনো শ্রদ্ধাও নেই, ধারণাও নেই,—কোনো গ্রাহ্যই সে করল না। নিতান্তই ছেলেমানুষি চপলতা মনে করে' সে হাস্‌তে হাস্‌তেই শুধু বলল—ঘর সাজানোটা খুব আর্টিষ্টিক্ হয়েছে!

তমসাও হেসে উত্তর দিল—থ্যাঙ্ক্ ইউ!—আচ্ছা তুমি দাঁড়াও এখানে একটুখানি, যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে যেও। আমি সরলাকে খবর দিয়ে আসি, আজ সন্ধ্যেবেলা ভট্‌চাযি্য মশাই আরতি করবেন।

তমসা তাড়াতাড়ি ছুট্‌লো ছাদে।

পায়ে যে চটিজুতো ছিল তা সনতের মনেই ছিল না। হাসি-মুখে সে ঠাকুর-ঘরে ঢুকে গেল। শিবলিঙ্গটির আকার-প্রকার দেখবার লোভ সে আর সম্বরণ করতে পারল না। কাছে গিয়ে বসে সিংহাসন থেকে সেটি তুলে নিয়ে সে বাইরে এল। তমসা যে রাগ করতে পারে, এ কথা তার মাথাতেই ঢুক্‌লো না।

ইতিমধ্যে ঝি-চাকরের কি একটা কলহ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। সনৎ এল তাড়াতাড়ি তাদের থামাতে। তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই থাম্‌ল কিন্তু সনৎ গেল শিবের কথা ভুলে!

গোলমাল থামিয়ে সে ইজি চেয়ারের ওপর এসে বসলো একখানা বই হাতে নিয়ে।

কিয়ৎক্ষণ পরে তমসাকে ঘরে ঢুকতে দেখে শিবের কথা তার মনে পড়ল। পকেট থেকে পাথরের নুড়িটি বার করে' সে বলল —সংস্কারটাই তোমাদের কাছে বড়, আইডিয়াটা নয়! নৈলে এর মধ্যে কী আছে বল ত?

দেয়ালের ধারে হতভম্বের মত তমসা বসে পড়ে বলল—কি ওটা তোমার হাতে?

সনৎ বলল—শিব গো, তোমার সেই নুড়িটা।

দেখতে দেখতে তমসার মুখখানা কঠিন, তীব্র, রুক্ষ হয়ে এল। চোখদুটো উঠলো ফুলে, মুখখানা হয়ে উঠলো রক্তের মত। উত্তেজনায় সে একেবারে চীৎকার করে' উঠলো—তোমার কি ভয় নেই? কি করলে তুমি? ওর যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে!

সনৎ সামান্য একটু অপ্রস্তুত হয়ে—ছেলেরা যেমন করে' গুলি খেলে তেমনি করে'—বাঁ হাতের মাঝের আঙুলের ওপর নুড়িটা রেখে ডান হাত দিয়ে একবার টেনে ছেড়ে দিতেই সেটা জোরে গিয়ে লাগল দেয়ালের গায়।

অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় তমসা শিউরে উঠে ভয়ার্ত্ত হরিণীর মত ঘর ছেড়ে চলে' গেল।

দেবতার এত বড় অপমান!

মাস খানেক কেটে গেছে।

নদীতে আর স্রোত নেই। ক্ষীণ ধারাটি বয় মৃদু গতিতে। একটা ক্লান্তি এসেছে।

বহুদূর পার হবার আগে শ্রান্ত পথিক যেমন সেই দিকে তাকিয়ে থাকে তমসাও তেমনি করে' ভাবে। সমস্ত জীবনটাকে পার হয়ে যাবার পরিশ্রম যে অনেকখানি! তমসা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে।

আপিস থেকে ফিরে সনৎ ঘরে ঢুকে নিজেই আলো জ্বালে!

—একি, তুমি অন্ধকারে বসেছিলে এতক্ষণ?

তমসা প্রথমে উত্তর দিল না। পরে বল্‌ল—একটু একটু করে' কেমন অন্ধকার জম্‌ছিল দেখছিলাম।

কাছে এসে সনৎ বল্‌ল—কি হলো তোমার, বলতো? এসো, আমার কাছে বসবে এসো। দিন রাত আজকাল তোমার সাড়া-শব্দ শোনাই যায় না। কেন, বলতো?

তুলে ধরে সনৎ তাকে কাছে এনে বসালো। বলল—শুধু ত রোগা হওনি, শ্রীহীন হয়ে গেছে। চুলগুলো হয়েছে ঠিক খড়ের আটি, গায়ের চাম্‌ড়া খস্ খস্ কচ্ছে, চোখ বসে যাচ্ছে—তোমার সেই অদ্ভুত লাবণ্য গেল কোথায়? কাল ত আবার ডাক্তারের কাছে গেছলাম, তিনি বললেন, রোগের কোনো চিহ্নই নেই! এ-সব তবে কি, তমসা? বলি, শুনচ?

উঁ!—তমসা মুখ ফিরিয়ে তাকালো। চোখদুটি তার গভীর কিন্তু অর্থহীন। একটা শূন্য দৃষ্টি স্বামীর মুখের ওপর বুলিয়ে সে

আলোর দিকে তাকালো। কথা বলবার যে একটা প্রাণবেগ, সেটা যেন তার ফুরিয়ে গেছে!

সনৎ বল্ল—কি ভাবচো তমসা?

ভাবচি? কৈ না! তারপরই সে তাড়াতাড়ি বল্ল—আলোটা নিবিয়ে দিলেই ত হয়, মিথ্যে জ্বলছে।

অন্ধকারে থাকবো? আগে ত কই তুমি আমাকে অন্ধকারে থাকতে দিতে না?

দিতাম না? ও।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তমসা সরে বসলো। খাবার দেওয়া হয়েছিল; ঝি এসে খবর দিতেই সনৎ উঠে বাইরে গেল।

নিজের হাত ও পায়ের আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তমসা কি যেন দেখছিল। হাড়ের কাঠির মত আঙুলগুলো যেমন শক্ত, বিশ্রী, তেমনি শুকিয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল, তার বিবশ আড়ষ্ট দেহটা দিন দিন একটু একটু করে' যেন পাথরের মত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

রাতে আলো নিবিয়ে নিঃশব্দে স্বামী-স্ত্রী বিছানার ওপর পড়ে থাকে। টুটু থাকে আয়ার কাছে, পাশের ঘরে। সনতের চোখে ঘুম আসে না, কোনো প্রশ্ন করতে গিয়ে তার যেন জিব আটকে যায়। ভারি জমাট অন্ধকার তার বুকের ওপর চেপে বসে।

অনেক রাতে গায়ের ওপর হাত রেখে সে বলে—আমি কি কোনো অপরাধ করেছি তমসা? কৈ, কিছু ত মনে পড়ছে না!

উদাস কণ্ঠে তমসা বল্ল—আমারো না!

তবে—তবে তুমি এমন হয়ে গেলে কেন? তবে এমন করে' আমার কাছ থেকে আল্‌গা হয়ে তুমি মিলিয়ে যাচ্ছ কেন?

তাইত! এ কথা কই তমসার মনে হয় [illegible]!

চঞ্চল হয়ে উঠে সনৎ তার মুখের ওপর চুম্বন করতে লাগল। তমসা কোনো সাড়া দিল না, বাধা দিল না, নিঃশব্দে স্থির হয়ে পড়ে' রইল।

সনতের মনে হলো, ওষ্ঠ তার শীতল, আবেগ-হীন, চুম্বন বিস্বাদ। তমসার সমস্ত দেহটাই অনাসক্ত, উদাসীন। আনন্দের কোনো কম্পন তার মধ্যে নেই।

তমসা?

উঁ?

রোজ এম্‌নি করে' সমস্ত রাত তুমি জেগে থাকো?

হুঁ। ঘুম আসে না যে।

আবার খানিকক্ষণ চুপ-চাপ। নিজের মধ্যে ডুব দিয়ে কোথায় যেন তমসা তলিয়ে যায়! ছায়াচিত্রের গতিতে নানা রকম অদ্ভুত চিন্তা তার মাথায় আসে। সে ভাবে, তার এই সাজানো সংসার যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে! স্বামীর উপার্জ্জন আর নেই, দেনার দায়ে মহাজনেরা ক্ষেপে উঠেছে। ঘর গেল, আসবাব গেল. স্ত্রী গেল,—ঝড়ে যেন চারিদিক ওলোট-পালোট হয়ে চলেছে।

ভাবতে ভাবতে সে হঠাৎ উঠে বসে। ঘর অন্ধকার, ঘড়িটা টিক্ টিক্ করছে! শব্দটা অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে হয়—মাথার মধ্যে অবিশ্রান্ত ঘা মেরে যেন ক্ষত-বিক্ষত করছে!

সনৎ ঘুমিয়েছে! আবার সে তার পাশে গিয়ে শোয়। এইটুকু পরিশ্রমেই সে হাঁপাতে থাকে।

......উঃ, এ কি—টুটু যে রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করছে! ডাক্তার এলেন, হ্যাঁ—কি বললেন, ডাক্তার বাবু? ও কি, মুখ ফিরিয়ে চলে' যাচ্ছেন কেন?

তমসা বড় বড় চোখে অন্ধকারের দিকে তাকাল।

......মাথার ওপর অশ্রুজলের আকাশটা টল্‌ টল করছে! টুটুকে কাঁধে নিয়ে সে চলেছে রিক্ত, রুক্ষ, তৃষ্ণার্ত্ত, মরুভূমি পার হয়ে। টুটু মরে গেছে, কেউ তাকে বাঁচাতে পারেনি। কাঁধ পেরিয়ে পিঠের দিকে টুটুর মাথাটা [illegible]ছে! চোখে তার চির-নিদ্রা, চির-অন্ধকার!......শ্মশান এল, নির্জ্জন সাগরের কূলে শ্মশান।......চিতার আগুন জ[illegible], কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া উঠলো ওপর দিকে, তারপর সাগর-তরঙ্গ এসে টুটুকে লেহন করে' নিয়ে গেল!

তমসা কাঁপছে! চীৎকার কর্‌বে? আওয়াজ কই? প্রাণ-পণে সে একবার নড়বার চেষ্টা করল, পারল না। বিছানায় সাপ ঢুকেছে কি, এমন করে' কামড়াচ্ছে কেন?

ঘড়িটা টিক্‌ টিক্‌ ক'রে রাত্রির অন্ধকারকে বিদ্ধ কর্‌ছে। দুলছে, নিদ্রিত গোলাকার এই পৃথিবীটা তার চোখের উপর দুলছে!

......ও কি, আগুন লাগলো কেমন করে? দেখতে দেখতে লাল হয়ে উঠ্‌ল চারিদিক। বাড়ী পুড়লো, ঘর পুড়লো, ইট-কাঠে আগুন লেগে পটাপট্‌ শব্দ হতে লাগল। যাঃ, সব যে গেল!

স্বামী গেল টুটুকে বাঁচাতে,—কৈ, আর ত বেরোল না! ওগো শুনচ, উত্তর দাও—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি বেরিয়ে এসো!

সনৎ আচম্‌কা উঠে বসল। তমসার গায়ে হাত দিয়ে দেখল, সে থর-থর ক'রে কাঁপছে,—এক গা ঘাম! হাত-পাগুলো বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

তমসা, এখনো ঘুমোওনি তুমি?

কম্পিত কণ্ঠে তমসা বল্‌ল—ঘুমোইনি? সকাল হল যে!

জান্‌লা দিয়ে সনৎ বাইরে তাকাল। পরে বল্‌ল—সকাল নয়, শেষ রাতের চাঁদের আলো, কাকগুলো ডাক্‌ছে, আবার এখুনি থেমে যাবে!

ও, থেমে যাবে এখুনি? আচ্ছা—অসমাপ্ত কথা তার মুখের মধ্যেই রয়ে গেল।

সকাল বেলা সনৎ খবরের কাগজ পড়ছে, আর জান্‌লার গরাদে মাথা কাৎ করে বাসি-মুখে তমসা বসে রয়েছে। একটু আগে টুটু এসে মায়ের কাছে কি একটা আব্দার ধরেছিল, তমসা তাকে ধমক দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। টুটুকে আজ কাল তার কেমন যেন ভাল লাগে না।

কাগজের ওপর থেকে এক সময় মুখ তুলে স্নিগ্ধ কণ্ঠে সনৎ বলতে গেল—কাল থেকে প্রায় উপবাস চলছে, মুখ হাত-পা ধুয়ে এবার কিছু—

বারুদের মত তমসা হঠাৎ ফেটে উঠল—আমার খুসী, না খেয়ে

থাকবো, তোমার কথা বলবার কি দরকার? খবরদার বলে দিচ্ছি কোন কথা কইবে না আমার সম্বন্ধে!

রুক্ষ কর্কশ হিংস্র মুখের চেহারা! দেখলে সত্যই ভয় করে।

থতমত খেয়ে সনৎ বল্‌ল—তবে শুধু মুখ ধোওগে?

না, বেশ করবো, খুব করবো—আমি এখানে বসে থাকবো। চুপ করে' বসে থাকবো। এইটুকু অধিকার আমার নেই, কেন বল ত? আমায় কি কিনে এনেছ?

একটুখানি হাসবার চেষ্টা করে সনৎ বল্‌ল—তুমি নিজেই রাগ করছ, আমি ত তা বলিনি তমসা!

থাক্, আর সাফাই গাইতে হবে না, আর ভালমানুষীতে কাজ নেই! ঢের হয়েছে, অনেক হয়েছে—এবার ছুটি দাও।

হু-হু ক'রে সে কেঁদে ফেললো।

এমনি করে' সে আজকাল কথায় কথায় বিপর্য্যয় কাণ্ড বাধিয়ে বসে।

আফিস যাওয়া সনৎ বন্ধ করল।

ঝি-চাকর বামুন-আয়া পর্য্যন্ত তটস্থ হয়ে রইল। সুশৃঙ্খল সুসজ্জিত সংসারটির মধ্যে প্রতিক্ষণেই ছন্দোপতন হতে লাগল।

বেলায় ভাত বেড়ে দিয়েছে, অনেক কষ্টে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সনৎ তাকে এনে খেতে বসালে। খেতে বসেও কেলেঙ্কারী! ভাত-তরকারী ছড়িয়ে জল ফেলে একাকার করল। সনৎ বল্‌ল—সবই ত ফেলে দিলে! দুটি খাও। আর নয় ত আমি খাইয়ে দেবো?

খাইয়ে দেবে? কেন, আমি কি, [illegible]? আমি কি কিছু জানিনে? এম্‌নি করে আমায় অপ[illegible] করা?

থালাটা তুলে সে ছুড়ে ফেলে দিল; পা দিয়ে ঠেলে দিল জলের পাত্রটা।

হাত ধুয়ে জামাটা গায়ে দিয়ে সনৎ ডাক্তার আনতে ছুটলো। ডাক্তারের বাড়ী গিয়ে সে দেখা পেল না, সেখান থেকে ছুটলো কবিরাজের বাড়ী। বৃদ্ধ কবিরাজকে নিয়ে সে যখন ফিরে এল, দেখল, ভিতরে হৈ-চৈ কাণ্ড বেধে গেছে।

ঘরের জিনিসপত্র তচ্‌নচ্‌ করা, বিছানা, বাক্স, দেরাজ, সমস্ত গৃহ-আসবাব একেবারে লণ্ডভণ্ড।

ঝি এসে কাঁদতে কাঁদতে তার একটা হাত দেখিয়ে বল্‌ল—ধরতে গেছলাম দাদাবাবু...আয়না ছুড়ে মারল...একেবারে রক্তারক্তি। কাঁচে কেটে গিয়ে বুড়ো মানুষ...

সনৎ একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বল্‌ল—টুটু কই?

ঝি বল্‌ল,—লোহার সাঁড়াশি নিয়ে ছেলেকে মারতে গেছল, আয়া নিয়ে পালিয়েছে!

বৃদ্ধ কবিরাজ মশাইয়ের কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল। দরজার কাছে এসে দেখলেন, আলুথালু অবস্থায় উপুড় হয়ে তমসা পড়ে রয়েছে।

ধীরে ধীরে বললেন—কি হল মা তোমার?

তমসা এবার উঠে বসলো। দুটি চোখে তখন তার অশ্রুর

ধারা নেমে এসেছে। ব্যাকুল হয়ে সে বলে উঠল—বড় কষ্ট পাচ্ছি, অসহ্য হয়ে উঠেছে!

কবিরাজ 'মধ্যম-নারায়ণ' তেলের ব্যবস্থা ক'রে গেলেন।

তেলের শিশি হাতে করে' এনে সনৎ যখন তার মাথায় মাখাতে বসলো, তমসা এক সুযোগে শিশিটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আছাড় মেরে চুরমার করে' দিল।

কিন্তু সে রাত আর কাটলো না! সময় নিকট হয়ে এসেছিল।

আলোটা জ্বালাই ছিল। নিশুতি রাত। সবাই গভীর নিদ্রায় অভিভূত। তৃতীয় প্রহরের চাঁদ নিমগাছের মাথায় জ্যোৎস্না মাখিয়ে আকাশে জেগে বসেছিল।

হঠাৎ করে এক সময় সনতের ঘুম ভেঙে গেল। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে একটু আগে তার তন্দ্রা এসেছিল। উঠে বসে সে দেখল, পায়া ভাঙ্গা আলমারির মাথার ওপর একটা টুল, তার ওপর অসম্বৃত অবস্থায় তমসা দাঁড়িয়ে, হাতে একটা কাঁসার গেলাস। গেলাস দিয়ে ঘড়িটাকে শাসিয়ে চোখ লাল করে সে চীৎকার করে উঠল—অনাচারি! নাস্তিক! তোমার ভালবাসা? তোমার ভাল-বাসায় ধর্ম্ম আছে?—বলতে বলতে বড় ঘড়িটার কাঁচের ওপর সে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করল।

ঘড়িটা তৎক্ষণাৎ চুরমার হয়ে দেয়াল থেকে মেঝের উপর সশব্দে ভেঙ্গে পড়ল। কিন্তু নিজে সে আর টাল সামলাতে

পারল না। টুল শুদ্ধ উল্টে হুড়মুড় করে আছাড় খেয়ে প'ড়ে গেল।

জিনিষ-পত্র সরিয়ে তার ভিতর থেকে সনৎ যখন তাকে টেনে তুল্‌লো, তমসার সর্ব্বাঙ্গ তখন রক্তারক্তি। কপালের রক্ত চোখ বেয়ে ঠোঁটের ওপর নেমে এসেছে। তমসা খিল্‌ খিল্‌ করে হাসছিল।

চেনা ও জানা

গ্রহে-উপগ্রহে নাকি মাঝে মাঝে ঠোকাঠুকি লাগে; নৈলে কোথাকার মানুষ কোন্ চড়ায় এসে ঠেকে আগে থেকে তার খবর কে বলতে পারে!

ছোট্ট একটি তীর্থস্থান, ধর্ম্মশালাটি তার চেয়েও ছোট। পালা-পার্ব্বণে আর বৎসরান্তে শিবরাত্রির মেলায় একটু ভিড় জমে, নৈলে যাত্রীর সমাগম বড় একটা হয় না।

একতলা পুরানো একটি বাড়ী, মাত্র গুটি তিনেক ঘর, খানিকটা খোলা জায়গা আর একটি কুয়াতলা। ঘরগুলি যেমন কালি-ঝুলি মাখা, তেমনি কাঠ-কয়লা দিয়ে শত শত পুণ্যার্থীর নাম সারা দেয়ালের গায়ে লেখা। পুণ্য লাভের চেয়ে অমরত্বের স্পৃহাটাই যেন বড় হয়ে উঠেছে। এদিক ওদিক চারিদিকে প্রকাণ্ড ধাউড়ো মাঠ—এই মাঠ পার হয়ে যাত্রীদের আসা একটু-খানি কষ্টকর বৈকি! কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মশালায় নাকি

ভূতের ভয় ছিল কিন্তু সম্প্রতি নূতন যাত্রীদের জন্য বিনা খরচে একদিনের মত আহারাদির নিয়ম বরাদ্দ হওয়ায় সে ভয় কেটে গেছে। সময় অসময় এখন প্রায়ই এক আধজন যাত্রীর দেখা মেলে।

ম্যানেজার বাবু বাঙালী; বয়স তাঁর বেশীও নয়, কমও নয়। কিন্তু তিনি যে ঠিক কেমনটি এ কথা নির্ণয় করা একটু শক্ত। তিনি গম্ভীর নন বলে' তিনি যে আমুদে বা বাক্‌পটু এ ধারণা করাও অন্যায়।

আজকাল ধর্মশালায় তাঁর আর পোষাচ্ছে না, নানা কারণে তিনি শীঘ্রই এখান থেকে চলে যাবার চেষ্টায় আছেন।

ঠিক এই সময়টার দেখা-শোনা।

একটি ঘরে সেদিন খুট্‌খাট্ শব্দ অনেকক্ষণ থেকেই চলছিল, বোধ করি কোনে নূতন যাত্রী এসে থাকবে। হাঁক ডাকের শব্দ বিশেষ কিছু নেই—যাত্রীটি যেন একা। ছেঁচা-বাঁশের বেড়ার পাশ থেকে ইনি বললেন—মেয়ে না পুরুষ কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে, সাড়া দাওনা গো বাপু?

ওপাশ থেকে কোমল কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ উত্তর এল—মেয়ে গো আমি, মেয়ে মানুষ, সাড়া আবার কেমন করে দিতে হয়?

তা বটে, হাতে বুঝি চুড়ি নেই? কোলে একটা ছেলে? তাও না?

আর কোনো উত্তর এল না। ম্যানেজার আবার বললেন—তা যাই হোক গে, আমার তাতে দরকার নেই! বলি এর মধ্যে

যদি চলে যাও ত নামটা আমার কাছে লিখিয়ে যেও বাপু। পুলিশের উৎপাতে নিয়ম আজকাল ভারি কড়া হয়েছে।

ওপাশ থেকে বেশ একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই জবাব এল, এত রাস্তা এলাম, এমনতর আদিখ্যেতা কিন্তু কোথাও দেখলাম না!

কি করি বল, পরের চাকরি বেয়াকুফি চলে যেতে পাল্লেই বাঁচি। আর দু' একদিন।—আচ্ছা দেখ, তুমি বাপু তীর্থ করতে এসেছ কিন্তু গলা শুনে ত বুড়োমানুষ বলে মনে হচ্ছে না!

নারীটি ওদিক থেকে বললো—সবাই কি বুড়োমানুষ, না সবাই তীর্থ করতে আসে?

ম্যানেজার তখন লেখাপড়ার কাজ নিয়ে বসেছিলেন, চশমাটা চোখে পরে খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললেন—কথার বাঁধুনি তোমার মন্দ নয় দেখছি; তা বেশ, যাবার সময় নামটি কিন্তু লিখিয়ে যেও মনে করে। আমি এই আগে থেকেই 'শ্রীমতি' দিয়ে রাখলাম। না হয় ত বল বাছা আগেই লিখে নিই। কি নাম? হরিমতি? অবলাবালা?

একটুখানি হাসির শব্দ শোনা গেল এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর এল—ছি ছি, ওসব আবার কি ছিরি নামের? আমার নাম শৈলবালা দেবী।

ম্যানেজার ফস ফস করে শ্রীমতির পাশে নামটি টুকে নিলেন। সকাল বেলা এ ছাড়া আর তাঁর কোনো কাজ থাকে না। যাত্রী আসুক বা না আসুক, খাতা পত্র উল্‌টে পালটে একবার তাঁকে দেখতেই হয়। এবার তিনি সেগুলি গুটিয়ে রেখে গান ধরলেন।

এক একবার গান ধরাটা শুধু তাঁর অভ্যাস নয়—প্রয়োজন! নিজের মহলে ঘুরে ঘুরে তিনি মাথা দুলিয়ে এমনি ভাবে গান করে থাকেন। বললেন—এ আমার চাইই চাই, গানের মাথামুণ্ডু কিছুই জানিনে; তা বলে সময় কাটাতে হবে ত?

ওদিক থেকে আর কোনো সাড়া এল না। কেনই বা আসবে? ম্যানেজার তখন কুয়াতলার পাশ দিয়ে এদিকে ঘুরে এসে দরজার কাছে দাঁড়ালেন। আলো থেকে এলে ভিতরটা অন্ধকারই মনে হয়। একটিমাত্র দরজা ছাড়া আলো-হাওয়া আসবার পথ আর নেই। বললেন—পোঁটলা পুঁটলি ত দেখছি, ওকি—রান্নার যোগাড় হচ্ছে কেন?

মেয়েটি উঠে এসে বলল—সব কথারই কি উত্তর দেওয়া যায়? কত ন্যাকা মানুষই দেখলাম! ওমা—গিরীশ বাবু যে!

হঠাৎ যেন একটা টাল্ খেয়ে দুজনে আবার স্থির হয়ে গেল!

গিরীশ বল্‌ল—তাই ত শৈলবালা, অনেক কাল পরে দেখা হল! এদিকে কোথায়?

'নিদ্রিত অতীত' এতটুকুও কেঁপে উঠলো না। এ যেন অতি সামান্য একটি আকস্মিক ঘটনা।

শৈলবালা বল্‌ল—বৃন্দাবন যাচ্ছি, পথে নামলাম। তুমি এখানে চাকরি কর? এই একলা মেড়োর দেশে? চুল ত কই তোমার এখনো পাকেনি?

উচ্চকণ্ঠে হা হা করে গিরীশ হেসে উঠলো। বল্‌ল—অথচ

এরই মধ্যে তোমার পরণে সাদা থান উঠে গেল! তাই বটে, শৈলবালা নামটা লিখতে গিয়ে তখন হাতটা কেমন কেঁপে উঠলো! আচ্ছা, এতকাল পরে চেনাচিনি হয়ে নিজেরাই আমরা অবাক হয়ে গেছি—নয়?

তা এ টু হয়েছি বৈ কি। অনেক দিনের ফাঁক—কথা যে বলতে পাি হ এই ঢের!

অনেক দিনের ফাঁকই বটে। এক যুগ কবে পার হয়ে গেছে। আচ্ছা শৈল, তুমি ত বোষ্টম ছিলে না, তবে নাকে তেলক আর গলায় কণ্ঠি নিলে কেন?

বয়স বোধ করি শৈলবালার তিরিশের কাছাকাছি গিয়েছিল তবু আগেকার মত তেমনি করে হাসতে সে এখনো ভোলেনি। শিশুর মত নিতান্ত নির্দ্দোষ হাসি হেসে দরজার চৌকাঠে মাথা হেলিয়ে বল্‌ল—এবার আর কাউকে ভয় করিনে, বৃন্দাবনে পা বাড়িয়েছি। সকল কথাই সত্যি বলতে পারি। সেই ত ছাড়া-ছাড়ি হয়ে ছিল, তারপর পাঁচ দফে ঘর বেঁধেচি গোঁসাইজী--এবার বোষ্টম না হয়ে উপায় কি বলত?

গিরীশ আবার হো হো করে হেসে উঠল। বলল—বোষ্টমী, আমারও ঠিক তাই। ও কম্ম হয়েছে তিন বার। একটি মরে গেল, একটি গেল পালিয়ে আর শেষেরটি বাপের বাড়ী থেকে আসতে চায় না—হা হা হা⋯...

তার পর গল্প চললো অনেকক্ষণ। নীড় হারা নরনারী দুটি মিলে তাদের লুপ্ত শৈশব আর কৈশোরকে এতকাল পরে আবার

মুখর করে তুললো। দুটি জলধারা যেন এক সঙ্গে বেরিয়ে এসে দুই বিভিন্ন নিরুদ্দিষ্ট পথে বয়ে গিয়েছিল, আজ বৃহৎ পৃথিবীর মাঝখানে এসে আবার তারা পরস্পরকে স্পর্শ করেছে! এই সামান্য আবেগটুকু অন্তত তাদের সম্বন্ধে প্রকাশ করা অন্যায় নয়।

সেই মুখরতাকে আর কতক্ষণই বা বাঁচিয়ে রাখা চলে! অতগুলি বছরের যে ছাড়াছাড়ি দুজনের মধ্যে রয়ে গেছে সে কি শুধু গোটাকয়েক বাজে কথাতেই ভরে উঠবে?

গিরীশ বল্‌ল—ঠিক কথাটি খুঁজে পাচ্ছ না, কেন বল ত শৈলবালা?

শৈলবালা বল্‌ল—পাবেও না কোনোদিন। বলে' সে আবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

গলা বাড়িয়ে গিরীশ বল্‌ল—আর শোন বলি একটা কথা। রান্নাবান্নার দরকার নেই, নতুন যাত্রীকে প্রথম দিন এখানে অমনি খেতে দেওয়া হয়—এই এখানকার নিয়ম! তোমার রান্না আমার সঙ্গেই হবে। বুঝলে?

নিজের কাজ করতে করতে ভিতর থেকে শৈলবালা বল্‌ল—না, তাতে আর কাজ নেই। আপনি এখন যান; তীর্থে এসে আমি আর প্রতিগ্রহ করবো না। যাই, চান করে' আসি।

মাথায় এক খাবল তেল দিয়ে কুয়ার কাছে আসতেই গিরীশ বল্‌ল—জল যে অনেক নীচে; আমি না হয় তুলে তুলে দিই, তুমি ভাল করে' চান করে নাও।

গা খুলে চান করবার সময় পুরুষ মানুষ সুমুখে দাঁড়িয়ে থাকবে? ওমা—কি লজ্জার কথা গো!

শৈলবালা চোখ তুলে তার দিকে চেয়ে বিস্ময়ের হাসি হাসতেই গিরীশ হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে আমতা আমতা করে' চলে গেল, এবং সেই যে গেল, সে-বেলায় আর তার দেখা পাওয়া গেল না।

বিকাল বেলা ঘর থেকে বেরিয়ে শৈলবালা দেখলো, ছেঁচা বাঁশের বেড়াটা এর মধ্যে কখন সরে গেছে; এদিক ওদিক এখন সমস্তই এক। এধারে বসে গিরীশ তখন বোধ করি গভীর মনোযোগের সহিত হিসাবের খাতা দেখছে। শৈলবালার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌ল—এই যে, জিরোনো হল? খাতা দেখাটা কিছু নয়, তোমার কথাই ভাবছিলাম। অনেক কথা বলবার আছে। আসনটা নিয়ে ওই দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসো।

বসে আর কি করবো, কথাই বা কি এমন হাতী-ঘোড়া।—বলে' শৈলবালা গিয়ে বসলো বটে কিন্তু দুজনের মধ্যে গভীর কোন আলোচনার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। অতীত দিনের পরিচয়কে ঘনীভূত করে' তোলবার কোনো সূত্রই আর ছিল না; পুরাণো অস্পষ্ট স্মৃতিকে বার বার ঝালিয়েই বা কি লাভ? দীর্ঘ দিনের জটিল এবং রহস্যময় ব্যবধানকে অতিক্রম করবার একটুখানি চেষ্টাতেই দুজনে ক্লান্ত হয়ে ওঠে।

বুদ্ধিযুক্ত কথাবার্ত্তা গিরীশ বড় একটা বলে না। তা ছাড়া কথার পাশে কথা যুগিয়ে চলা তার পক্ষে একটুখানি শক্ত। বলল —যাই দেশে ফিরে। সরকার থেকে পেন্সন্ পাচ্ছি, আমার

ভাবনা কিসের ? ভাল করে মাছ-মাংস খেয়ে বাঁচবো, মেড়োর দেশে নিরামিষ খেয়ে খেয়ে মরতে বসেছি। হরি হরি বল ! দিব্যি একলা একঘরে থাকবো, গঙ্গা নাইবো, হরিনাম করবো—মরে গেলে মুচি-মেথরে টেনে ফেলবে, বাস্—খতম্।

শৈলবালা বল্‌ল—আমারও বাঁধা পথ। বৃন্দাবন ছাড়া এক পা নড়বা না ; গান গাইতে জানি, কিছু কিছু ভিক্ষেও মিলবে ; যমুনার ধারে ঘর ভাড়া কর্‌বো; মন্দিরে বসে পূজো করবো—নিজের জন্যে আমার কোনো ভাবনাই নেই। তারপর ফুলটি ঝরে' গেলে কেউ জানবেও না, শুনবেও না !

গিরীশ বল্‌ল—হ্যাঁ সেই ভালো ; সংসারের অনেক জ্বালা ! এই দেখ না, মালা বদল কল্লাম তিন তিনবার, একটাও ভোগে এল না ; আচ্ছা শৈল, তুমিই বল ত, আর কি বিয়ে করতে ভালো লাগে ?

শৈলবালা বলল—রাম বল ! বিয়ে আবার মানুষে করে ? তারপর কি একটা কথা মনে করে' সে হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠলো।

গিরীশ একবার মুখ ফিরিয়ে দেখলো। বল্‌ল—হুঁ, তুমিও এ কথাটা ভাল করে' বুঝতে পেরেছ দেখছি।

আমি যে মেয়েমানুষ, বুঝতে পারি তোমাদের আগেই। সামান্য একটি জিনিষকে বুঝতে গিয়ে সমস্ত জীবনটাই আমাদের নষ্ট করতে হয়।

কিন্তু এত বড় বড় তত্ত্বকথা গিরীশ বুঝতে পারে না। স্ত্রী-

লোকের সঙ্গে বহুকাল সে বাক্যালাপ করেনি, কোনো রকমে কথা কয়ে যাওয়াটাই তার লাভ! বল্‌ল—উঃ—কতই দেখলাম, চাকরীতে ঢুকে এস্তক সারা ভারতটাই ঘুরেছি। কত কাণ্ড করলাম, কত লোককে মানুষ করে দিলাম, কত লোক আমার পায়ের তলা দিয়ে রাজা-উজীর মেরে গেল! নিজেই কি কম ছিলাম? উনিশ শ' উনিশ সালে এগারো লাখ টাকার সম্পত্তিটা নিলামে চড়ে যেতেই বাস্ অমনি ছোট তরফের জমিদারীটা হাত করে ফেললাম! আমার আর কি, বুঝলে শৈল, মহাজন থেকে জমিদার—একই কথা! তারপর বুঝতেই পাচ্ছ, আমার মত খরচে লোকের হাতে জমিদারি, প্রজারা যে যা চায়, বুঝলে কি না,—এ দিকে মেজবৌটা পালিয়ে যেতেই বাস্, এক সঙ্গে পঁচিশটা চাকরাণী রেখে দিলাম। একই কথা শৈল, কথাটা একই; বৌ আর চাকরাণী।

শৈলবালা একবার চোখ তুলে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার প্রতি তাকিয়ে একটুখানি হাসলো।

একটু থেমে গিরীশ আবার বল্‌ল—কিন্তু হায় রে ভগবান, কপাল যে সঙ্গে যায়, কপাল ছাড়া কি আর পথ আছে মানুষের? দেখতে দেখতে নদী শুকিয়ে গেল, চারিদিক ধূ ধূ করে উঠলো, চড়ায় ঠেকে বান-চাল হয়ে গেলাম! তারপর এই যখন অবস্থা তখন পাতিয়ালার মহারাজকে ডেকে পাঠালাম। লোকটা এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াতেই আমি আঙুল নেড়ে তাকে বললাম যে......

শৈলবালা নিবিষ্ট মনে তার এই প্রলাপগুলি শুনছিল কিম্বা অন্য দিকে চেয়ে একান্ত উদাসীন হয়ে ছিল তা বোঝা গেল না। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে গিরীশকে থামিয়ে চট্ করে বলে উঠলো—কি আশ্চর্য্য, আমার সঙ্গে অনেকটা মিলে যাচ্ছে কিন্তু; আমারও ঠিক তাই! অল্প বয়সে তিনি যখন আমায় ফেলে রেখে সন্নিসি হয়ে গেলেন, বলতে গেলে আমি তখন রাজরাণী! তিন চারখানা সোণার পালঙ্ক ছিল, মনের দুঃখে এক একখানি করে রাস্তার লোককে বিলিয়ে দিলাম। সবাই রাণীমা বলে ডাকে, ঝি-চাকর আর দরোয়ান মিলে সবশুদ্ধ উননব্বইটি, সকলকেই পাঁচ শ' করে মাইনে দিতাম। আর নগদ টাকা? হায় রে, সেবার আমার নাম শুনে খানিকটা গোলাপের আতর পাঠালো বলে দিল্লীর নবাবকে খুসী হয়ে দশ লক্ষ টাকা দান করে দিলাম। দান করাটা আমার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

গিরীশ আর একবার হেসে উঠলো। এবার আর কথা খুঁজে পেতে দেরি হয় না। বল্‌ল—ঠিক তাই, বুঝলে শৈল, ঠিক আমারও তাই। তোমার ওটা অভ্যেস, আর আমার ওটা রোগ। সারে না! এখানে আছি শুনে সেই কোন্ বাঙলা দেশ থেকে মেয়ের বাপ ছুটে এসে ধরলো, কন্যে দায়, কিছু সাহায্য চাই। পুঁজি তখন আমার আর বিশেষ কিছু ছিল না। চাইলো বটে দু'হাজার, তবু হাজার বারো টাকা দিয়ে দিলাম। আচ্ছা তুমিই বলত' শৈল, দু'হাজারে আজ কাল মেয়ের বিয়ে হয়?

শৈলবালা একটুখানি চুপ করে রইলো, পরে মুখের একটা মৃদু

শব্দ করে বলল—দানটা ত আছেই, তা ছাড়াও অনেক রকমে টাকা যায়। এই কদিন আগে গয়া হয়ে কাশী আসবার সময় আমার পুঁটলিতে কুড়িয়ে বাড়িয়ে এই সামান্য সাত-আট শ' টাকা ছিল,—চোখের সামনে একটা ছোঁড়া পুঁটলিটা তুলে নিয়ে গেল! তার যখন চুরি করতে লজ্জা হল না, তখন আমিই বা কেন ধরে ফেলতে যাবো?

গিরীশ মুখ তুলে একবার অবাক হয়ে তাকালো, এত বড় উদারতা—এ যেন ঠিক বিশ্বাস করা যায় না।

আলো জ্বালবার সময় হয়ে এসেছিল। উঠে দাঁড়িয়ে শৈলবালা বল্‌ল—ভুলেই গিছলাম যে সেদিন আর নেই, তা ছাড়া পুরোণো কথা মনে করেই বা কি লাভ?—বলে আড়চোখে নিতান্ত অবজ্ঞাভরে গিরীশের দিকে একবার তাকিয়ে সে ওধারে চলে গেল।

আলো জ্বেলে খানিকক্ষণ পরে যখন সে বাইরে এসে বসলো, গিরীশ তখন ওধারে অন্ধকারেই পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

বল্‌ল—আলো জ্বালেন নি যে?

গিরীশ পায়চারি থামিয়ে বল্‌ল—আলো আমার নিবে গেছে।

ও—কিন্তু জ্বালতে ত কই দেখলাম না?

হঠাৎ একটু থতমত খেয়ে গিরীশ বল্‌ল—না তাই বলছি—আর তা ছাড়া দেখো, যোল টাকা মোটে মাইনে পাই, এর ভেতর থেকে যদি কেরোসিনের দাম দিতে হয় তা হলে—

কথায় যেন তার একটুখানি দুঃখের সুর বেজে উঠলো। এই টুকুই যেন তার পক্ষে সত্যি!

শৈলবালা বল্‌ল—আমারও তাই, দু' পয়সা দিয়ে একটি বাতি কিনে রেখেছি তাই জ্বালি আর নিবিয়ে রাখি। একটি বাতি আমার দশ দিন চলে।

তাই ত শৈল, কথাটা ঠিকই। দুঃখের দশায় পড়লে মানুষের দিন কত মতলবে যে চলে তা আমাদের চেয়ে আর কে বেশি জানে!

শৈলবালা শুধু বল্‌ল—সেই কথাই ত ভাবছি!

গিরীশ আস্তে আস্তে সরে এল। আলোটা আড়াল করে শৈলবালার মুখের কাছে বসলো। বল্‌ল—দেখো? বলে একটু থেমে এদিক ওদিক চেয়ে আবার বল্‌ল—এই রাত চারিদিকে ঘনিয়ে এলে কোনো কথা আর আমার মনে থাকে না, কেন বল ত? আমি তখন—সত্যি বলছি তোমাকে—নিজেকে আর ঠিক বুঝতে পারিনেঁ।—আচ্ছা শৈল বৃন্দাবনে গিয়ে তুমি নিশ্চয় বেশ সুখে থাকবে—নয়?

সুখ আর কি! নিভাবনায় যদি জোটে একমুঠো, তাই লাভ!

না যদি জোটে?

তা হলে গোবিনজির মন্দিরের দরজায় পড়ে থাকবো।

ফোঁস করে একটি নিঃশ্বাস ফেলে গিরীশ বল্‌ল—তাই বটে, সবাই আমরা এমনি নিরুপায়!

আলোর কাছে এতক্ষণ একটা পোকা উড়ে বেড়াচ্ছিল, শৈল-

বালার গায়ের ওপর এসে হঠাৎ বসতেই গিরীশ সেটাকে সরিয়ে দিল। ইত্যবসরে তার প্রতি তাকিয়ে শৈলবালা বল্‌ল—চোখ অত লাল হলো কেন আপনার?

গিরীশ বল্‌ল—রাত হলেই অমনি আমার হয় শৈল।

দেখি কপালটা?—বলে' হাত দিয়ে তার কপালটা একবার পরীক্ষা করে' শৈলবালা বল্‌ল—না, কিছু নয়!

গিরীশ আবার সরে গিয়ে বসলো; কিন্তু তাকে এদিক ওদিক ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকাতে দেখেই শৈলবালা আবার বল্‌ল—কি দেখছেন?

মুখ ফিরিয়ে গভীর বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে গিরীশ বল্‌ল—একলা থাকি আমি শৈল, মাঠের মাঝখানে এই ফাঁকা বাড়ীটায় দিন রাত আমায় একলা থাকতে হয়। রাতে অনেক রকম শব্দ কানে আসে, ঘুরে ঘুরে আমি সেইগুলো খুঁজে বার করি।

খানিক রাতে সে উঠে চলে গেল। সেটা গরম কাল। মাঠ পার হয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল। চাঁদের আলো উঠেছে। দরজা খুলে রেখে শৈলবালা শুয়ে পড়লো; ভয়-ডর তার এতটুকু নেই।

গিরীশের একটা প্রবল অনিদ্রার রোগ আছে। রাত্রির গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন বিশেষভাবে জেগে ওঠে। দূরে কাছে সমস্ত বস্তুর খুঁটি নাটি সে স্পষ্ট দেখতে পায়। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে নানা পথে নিজেদের প্রসারিত করে দেয়। প্রতি রাত্রির অনিদ্রা তাহা সমস্ত চরিত্রের ওপর যেন একটি গভীর রেখা-পাত করে রেখেছে।

অন্ধকারে টহল্ দিতে দিতে রাত শেষ হয়ে এল। গিরীশ তখন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। এতক্ষণ তার কোনো খেয়ালই ছিল না। দীর্ঘকাল ধরে' অন্ধকারে পায়চারি দিয়ে দিয়ে সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে দেখলো, সুমুখের ঘরেই শৈলবালা অকাতরে ঘুমিয়ে রয়েছে। তার দিকে চোখ পড়তেই হঠাৎ চারিদিকের নিঃসঙ্গ একাকীত্ব যেন ভয়াবহ হয়ে উঠলো। মনে হলো চারিদিক থেকে এক সঙ্গে কতকগুলি ছায়ামূর্ত্তি নড়ে উঠে তার দিকে এগিয়ে আসছে। ভয়ে তার বুকের ভিতরটা দুপ দুপ্ করে উঠলো।

আর একটু পরেই আকাশ পরিষ্কার হতে লাগলো। শৈলবালার ঘুম পাতলা হয়ে এসেছিল, আলস্য ভাঙবার জন্য হাত-পা ছাড়াতেই—ওমা, এ কেগো?

ধড়মড় করে উঠে বসে সে চীৎকার করতেই যাচ্ছিল, হঠাৎ গিরীশকে দেখে চুপ করে' গেল। উত্তেজনায় মুখখানা আরক্ত করে বল্‌ল—সারা বাড়ীটায় কি আর শোবার জায়গা মিল্‌ল না, —একেবারে এক ঘরে, গায়ে-গায়ে? মেয়ে মানুষ বলেও ত মেনে চলা উচিত? লোকে দেখলে এখুনি বল্‌ত কি বল দিকি? হলেই বা পুরোনো আলাপ!

গিরীশ একবারটি জেগে উঠলো। শেষের কথাটা তার কাণে গিয়েছিল। চোখ চেয়ে বল্‌ল—আঃ, বার বার কেন বিরক্ত করছ বলত? শুয়েছি বেশ করেছি। এ আমার ঘর, আমি এখানকার ম্যানেজার,—ষোল টাকা মাইনে পাই।—বলে সে

আবার পাশ ফিরে শুয়ে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে গেল। রাত্রি শেষে এই সময়টাতেই সে ভাল করে' ঘুমোয়।

শৈলবালা নিঃশব্দে খানিকক্ষণ বসে' রইল; পরে এক হাতে গিরীশের মাথাটি মাটি থেকে তুলে তার তলায় নিজের ছোট্ট বালিশটি এগিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। একটি স্নিগ্ধ হাসি তার মুখের ওপর খেলে বেড়াচ্ছিল।

খানিক বেলায় গিরীশের ঘুম ভাঙলো। শৈলবালা তখন আহ্নিক সেরে উঠছে। চোখ রগড়ে উঠে বসে' গিরীশ বল্‌ল—চমৎকার ঘুমোলাম। অনেক কাল আগে সেই মেজবৌ থাকতে এমনি আরামে ঘুমোতাম। মনে হতো কোনো দুঃখই আমার নেই।

শৈলবালা বল্‌ল—বৌ ত ছিল তিনটে। বার বার শুধু মেজ বৌকে নিয়ে টানাটানি কেন?

রূপ ছিল তার—রূপ, বুঝলে শৈল? তার চেয়ে তার রূপ-কেই বেশি ভাল বাসতাম। ছুঁড়িটা ফস্‌কে পালিয়ে গেল! অনেক খোঁজাখুজি করেছি, ধরতে পারলে মেয়েটাকে বেঁধে রেখে দিতাম্‌! কিন্তু---যাকগে তার কথা!

কথার ভঙ্গিতে মনে হলো, গিরীশ আবার তার প্রলাপের পথ ধরে' চলেছে।

কাপড়ের মধ্যে মালাটি জপতে জপতে শৈলবালা বল্‌ল—এমন মিল আর কোথাও দেখলাম না কিন্তু। নিজের কথা বলতে লজ্জা করে, তা হোক—আমার প্রথমটি ছিলেন একেবারে ময়ূর ছাড়া

কার্তিক। রূপে গুণে রাজা-রাজড়ার ঘরেও অমন মানুষ জন্মায় না। কিন্তু কই, তাঁকে ত রাখতে পারলাম না, বিধাতা হিংসে করে' নিজের কাছে টেনে নিলেন! কপাল—কপাল ছেড়ে মানুষ যাবে কোথায়?

গিরীশ পুনরায় বল্‌ল—আর ভাল লাগে আমার ছোট বৌ-টাকে, এই যেটি বাপের বাড়ী থেকে আসতে চায় না।—তার জন্যে আমি সব দিতে পারি শৈল।

শৈল বল্‌ল—এ কথা আর বলছেন কাকে? ভাল যাকে লাগে তার জন্যে অনেক দুঃখু সইতে হয়। মেয়ে মানুষ হয়ে লাজ-লজ্জা একজনের জন্যে সমস্ত ডুবিয়ে দিলাম; স্বামীর পাশ থেকে উঠে রাতের বেলা তিনটে রাস্তা পেরিয়ে তাঁর বাড়ীর জানলার নীচে কতদিন ঘোরাঘুরি করেছি; তিনি অপমান করেছেন আমি মুখ বুজে চলে' এসেছি—তবু রাগ করিনি তাঁর ওপর—সে-দিন আমিও সব দিতে পারতাম—বুঝলেন?

কোনো কথাতেই শৈলবালাকে পেরে ওঠা যায় না। জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাতেই সে যেন গিরীশের চেয়ে এতটুকু কম নয়। কথায় কথায় দুজনে এমনি মশগুল হয়ে যায় যে, মাঝখানের চৌদ্দ বছরের গল্প বলতে বলতে চৌদ্দটা বছরই তারা কাটিয়ে দিতে পারে। তার মধ্যে সত্যের সঙ্গে মিথ্যা কতখানি জড়িয়ে থাকে তা ভগবানই জানেন।

যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে হবে—শৈলবালার মনে মনে একটা তাড়া ছিল। রান্না চড়িয়ে সে বল্‌ল—বামুন ভোজন করাবো

ভাবছিলাম, আপনাকে পেয়ে ভালই হলো। এ বেলা আপনি এখানেই খাবেন।

গিরীশ বেরিয়ে এসে বল্‌ল—আজই তুমি বুঝি চলে' যাবে?

হ্যাঁ আজকেই, আর দেরী করতে পারিনে।

তা হলে খেয়েই নিই একদিন তোমার হাতে।—বলে' সে স্নানের জন্য তাড়াতাড়ি ওদিকে চলে' গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর গিরীশ বল্‌ল—আমিও যাবো। সবই আমার তৈরী, এ মাসের মাইনেও পেয়ে গেছি। দুদিন বাদে চলে' আমি যেতামই শৈল, তবে তুমি আসতে সেটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেল।

শৈলবালা একটু হেসে বল্‌ল—এ যে কাঁচপোকা তেলা-পোকাকে টেনে নিয়ে চললো!

গিরীশ অত হেঁয়ালী বোঝে না। বল্‌ল—হাঙ্গাম কিছুই নেই। একটা ব্যাগ, বিছানা আর একটা বাক্স। ঘরে তালাটি দিয়ে টুক্ করে পথে গিয়ে নামবো। তুমি যাবে একদিকে, আমি যাবো আর একদিকে।

এ ছাড়া আর কোনো কথাই তাদের মধ্যে হলো না। কি কথাই বা হবে! মুখে চেনাচেনি হলো বটে কিন্তু পরস্পর পর-স্পরের কাছ থেকে বহুদূরে চলে গেছে। দুজনেই যেন দুজনের কাছে নিরুদ্দেশ। কোনো দুর্ব্বলতা, কোনো হৃদয়াবেগ, কিম্বা কোনরূপ দ্বিধা তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পথে বাধা ঘটালো না।

ঠিক সময়টিতে গরুর গাড়ী এসে হাজির হলো! জিনিস পত্র

তুলে দিয়ে হেঁট হয়ে গিরীশ ছই-এর ভিতরে গিয়ে উঠলো; তার-পর শৈলবালাকেও হাত ধরে' তুলে নিল। ভিতরে জায়গা অতি অল্প, একটু গা ঘেঁষাঘেঁষি করেই বসতে হলো বটে। তার ওপর চলতে চলতে আবার গরুর গাড়ীর ঝাঁকানি লেগে যে অবস্থাটা হচ্ছিল তাতে লজ্জিত হওয়াই স্বাভাবিক।

মাঠের মাঝখান দিয়ে গাড়া চলছে, হঠাৎ একটা লোক ছুটতে ছুটতে এসে গাড়া থামালো। তারপর একবার গাড়ীর মধ্যে উঁকি মেরে গিরীশকে দেখে বল্‌ল—বেশ ঠাকুর, বেশ আক্কেল তোমার। পরণের কাপড় কাচিয়ে পয়সা মেরে সরে পড়েছো? বেশ!

থতমত খেয়ে গিরীশ বল্‌ল—সরে পড়েছি! বাঃ—বেশ লোক তুমি লখিন্দর! তোমার পয়সা মারবো আমি? বাঃ! একেবারে অরাজক!

তবে দিয়ে দাও না; মিছে কেঁড়েলি করছো কেন? মাত্তর ছটা ত পয়সা!

কিন্তু খুচরো পয়সা গিরীশের ছিল না। তাকে উস্‌খুস্‌ করতে দেখেই শৈলবালা বল্‌ল—আচ্ছা দাঁড়াও, আমি দিচ্ছি—বলে সে তৎক্ষণাৎ পয়সা বার করে দিল।

পয়সা পেয়ে লোকটা ঘুরতেই গাড়ী আবার চললো। শৈল-বালা একটু হেসে বল্‌ল—আপনার মিথ্যে কথাগুলো একটু কাঁচা, শেষ রক্ষে হয় না! ধরাই যদি পড়বেন তা হলে পাপ করেন কেন? আমি ত কাল অবধি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বল্‌চি। তা বললে

কি হয়; বার চারেক মালা জপ করে নিলাম—বাস, সব ঠিক হয়ে গেল।

গিরীশ একটু মুসড়ে পড়েছিল; এবার কিন্তু চরম বাহাদুরির চেষ্টায় অকস্মাৎ বলে উঠলো—মুদির দোকানে আটগণ্ডা পয়সা ত মেরে দিলাম! বেটা ভারি ঠকাতো!

শৈলবালা নিঃশব্দে শুধু একটু করুণার হাসি হাসলো। বল্‌ল—পরের অনিষ্ট হয় এমন মিথ্যে নাই বা বললেন। বললে সে পাপ আর খণ্ডায় না!

ইষ্টিশানে এসে দুজনে নামলো। বৃন্দাবনের গাড়ী তখন আর ছাড়বার দেরী নেই। তাড়াতাড়ি টিকিট কিনে শৈলবালা গাড়ীতে উঠে বসলো। গিরীশ বল্‌ল—আমার টিকিট একটু দেরীতে কিনলেও চলবে। গাড়ীর দেরী আছে এখনও।

তা সে যাই হোক, আমার ছটা পয়সা দিন দেখি? আমি সত্যিই গরীব লোক!

নেবে? তা নেবে বৈ কি, দিয়েছ যখন, তখন—

গাড়ী ছেড়ে দিতেই অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছয়টি পয়সা বার করে গিরীশ তার হাতে তুলে দিল। শৈলবালা একবার তার দিকে তাকালো, এক মুহূর্ত্ত চুপ করে রইলো, পরে বললো—একে মিথ্যে বাদী, তার ওপর বোকা—তোমার পয়সা ছুঁতেও নেই—বলে হাত বাড়িয়ে গিরীশের গায়ের ওপর পয়সাগুলি ছুড়ে দিয়ে জানলা থেকে মুখ সরিয়ে নিল। রাগে তার চোখ দুটি সজল হয়ে এসেছিল।

———

নক্সা-দর্পণ

মেয়েদের জটলা বসে—।

সভার উদ্বোধন পিসিমাই করেন। নতুন দিদি হন বক্তা।

বিষয়-বস্তুটা আরম্ভ হয় প্রথম সমাজ-নীতি থেকে। শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায় মেয়েলি তুক্-তাকে এবং বৈরাগী-সন্ন্যাসীর কাছে 'মন্তর' নেওয়ায়।

রান্না বান্না সম্বন্ধে আলোচনা করেন সাধারণতঃ ও-বাড়ীর মেজ গিন্নী।

মেয়েরা সবাই সাগ্রহে কাণ পেতে শুনে যায়, সমবয়সীদের সঙ্গে কানাকানি করে, অলক্ষ্যে গা টেপাটিপি করে' হাসি চেপে থাকে। নতুন দিদির কথা শুনলে হাসতে হাসতে পেটে খিল্ ধরে' যায়। ছোট ছেলেমেয়ের মাথা খাবার তিনি ওস্তাদ।

—ধন্যি আমাদের খগেন মিত্তির! বেটার বিয়েতে একেবারে ডুবে ডুবে নিলে গা? পোড়া দেশ থেকে মেয়ের বিয়েতে টাকা নেওয়াটা কবে উঠবে মা?

কে একটা মুখরা মেয়ে ওপাশ থেকে বল্‌ল—তুমি আর বলো না নতুন দি'—নিজের বেলায় তুমিও সাত-কাহন! ছোট ছেলের বিয়েতে তুমিই বা কি কম নিয়েছ শুনি? বলে অমন সবাই!

আ পোড়ারমুখি, আমাকে অপ্রস্তুত করবার চেষ্টা কচ্ছিস। কই বলুক দেখি কেউ এখানে, একটি পয়সা কেমন আমি ঘরে তুলেছি? তবে হ্যাঁ, গয়নাগাঁটি না দিলে বউকে বার করব কেমন করে' লোকের কাছে! মান-সম্ভ্রম বাঁচাতে হবে ত?

সঙ্গিনীকে থামিয়ে দিয়ে বিমলা একটুখানি দুষ্ট হাসি হেসে বলল—একই কথা। টাকা নাওনি, গা-ভোর গয়না নিয়েছ,—তুমিই আসল ব্যবসাদার!

নতুন দিদি এবার গেল একটু দমে, কিন্তু পরক্ষণেই বল্‌ল—বড় লোকের মেয়ে বলে' তোকে রেহাই দেবো না বিম্‌লি। বিয়ের ব্যবসা বরং চলে কিন্তু বিয়ের আগে তুই যা দেখাচ্ছিস তা আর এখানে কারো জান্‌তে বাকি নেই। কি ভাগ্যি যে পাকা ব্যবসাদার তুই ন'স্‌।

হঠাৎ এই আকস্মিক দংশনে বিমলা বজ্রাহত হয়ে চুপ করে' গেল। সুমুখে একঘর মেয়ে, যথাসম্ভব আত্মগোপন করতে গিয়েও তার মুখখানা ফ্যাকাসে ও কালীবর্ণ হয়ে এল।

নতুন দিদি নতুন প্রসঙ্গ তুলে আবার অন্য পথে চলে' গেল। কিন্তু বিমলার প্রতি তার এই কদর্য্য ইঙ্গিতটা ঘুরে ঘুরে সবার কাণেই কেমন যেন বিসদৃশ হয়ে বাজতে লাগল।

হাওয়াটা ধীরে ধীরে হালকা হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সকলের

চোখ এড়িয়ে বিমলা যে কোন্ এক সময় উঠে চলে' গেছে তা তখনকার মত কেউ জানতেও পারল না।

এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ী যেতে হলে রাস্তা পার হয়ে আসতে হয়। বিমলা এসে ফটকের মধ্যে ঢুকল। দুধারে লাল ও সাদা পাঁচ-পাপড়ি এবং দোপাটি ফুলের কেয়ারিকরা বাগান। বিমলা অকারণেই তার মধ্যে ঢুকে সরাসর ওপরে নিজের ঘরে চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই সে দেখল, মা মোহনভোগ তৈরী করছেন আর তারই সুমুখে মেঝের ওপর বসে অবনীদা গভীর মনোযোগের সঙ্গে একখানি বিলাতী মাসিকপত্রের চিত্র-সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করেছে।

ছেলেটির সঙ্গে একবার তার চোখচোখি হল, তারপর বিমলা মুখ ফিরিয়ে ওপরে উঠে গেল।

—হ্যাঁ তারপর? ছবির চর্চ্চা ওদের দেশে খুব, কেমন? সেদিন কোথায় যেন পড়ছিলাম, ওদেশে সাহিত্যের চেয়ে চিত্রেই বেশি উন্নতি হয়েছে, কেমন?

—হুঁ!

মা বললেন—মুখপোড়া মেয়ের মোহনভোগ পড়ে রইল, কোথা গেল কে জানে!

অবনী বল্‌ল—ওপরে গেল যে এইমাত্র!

—দেখলি নাকি?

—হুঁ।

তবে বাছা এইটে দিয়ে আয় ওকে একবারটি। দশবার ডাকলে তবে ও-মেয়ে নামবে। যা বাছা।

আমাকে দিয়ে তোমার মেয়ের সেবা করাবে মাসিমা? বরং এ বাড়ীতে যখন এসেছি তখন আমাকেই ওর এনে দেওয়া উচিত।

মাসিমা হাসতে হাসতে বললেন—হাওয়া বদ্‌লে গেছে!

মোহনভোগের রেকাবিটা হাতে নিয়ে অবনী ওপরে উঠে গেল।

গায়ে মাথায় মুড়ি দিয়ে বিমলা বিছানার ওপর শুয়ে ছিল। অবনী ঘরের মধ্যে এসে ঢুক্‌লো। পায়ের কাছে এসে একটু হেসে বিমলার পায়ের তলায় সে সুড়সুড়ি দিল। পা শক্ত করে' বিমলা পড়ে রইল কাঠের মত।

অবনী বল্‌ল—মাসিমা বলছিলেন তুমি মুখ ফুটে কাউকে কিছু বল না। কেন বল ত শুনি?

বিমলা তবু রইল চুপ করে'। অবনী হঠাৎ বল্‌ল—তা বলে তোমার অসুখ বিসুখ যে কিছু হয়নি এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি বিমলা।

বিমলা এবার মাথা তুল্‌ল। বল্‌ল—আমার শরীর কি পাথরে গড়া?

অবনী হেসে বল্‌ল—শরীরটা নয়, মনটা।

বিমলাও এবার না হেসে থাক্‌তে পারল না। আস্তে আস্তে উঠে বসে বল্‌ল—তোমার জন্যে আজকাল লোকের কাছে আমায় যা তা শুনতে হচ্ছে। এসব আমার ভাল লাগে না কিন্তু। বাঃ আজ যে একেবারে চক্‌চকে হয়ে আসা হয়েছে! হঠাৎ? বিয়ে করতে যাওয়া হচ্ছে নাকি?

ইঙ্গিতটা অবনী বুঝে একটুখানি হাসল। তারপর নিজের জামা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে সে বল্‌ল—কি করব বল, বড়লোকের বাড়ী আসতে গেলে—

—থাক্ হয়েছে, তা দাঁড়িয়ে থাকা কেন—হুকুমের অপেক্ষায়? বসো না ওই চেয়ারটায়।

অবনী বল্‌ল—মহারাণীর জয় হোক্।

অবনীর হাত ধরে' বিমলা একটু হেসে মচ্‌কে দিল। টেনে বিছানার ওপর বসিয়ে বল্‌ল—আজ এত রাজভক্তি যে?

মুখ টিপে অবনী বল্‌ল—রাজভক্তি নয়, রাণী প্রীতি!

বিমলাকে সে যে সত্যিই ভালবাসে এ আর না বললেও চলে। প্রতিদিনই সে প্রেম গভীর হতে গভীরতর রূপ নিয়েছিল। বিমলাকে দেখলে তার মুখের কথা যেত থতিয়ে, বুকের মধ্যে টিপ টিপ করত। একাকী ঘরের মধ্যে বসে বিমলাকে স্ত্রীর মত ক'রে নিয়ে মনে মনে সে ঘর বাঁধত, সংসার করত; কল্পনায় তাকে নিয়ে সে বহু দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করে' বেড়াত।

অবনী সৎপাত্র সন্দেহ নেই। চারটে পাশ, পরিচয়ে কুলীন, স্বভাব চরিত্র সুসংযত, ঔদ্ধত্যহীন তারুণ্যে বিনয়ী—ছেলে সে ভালই। কিন্তু তার আর্থিক প্রতিষ্ঠা ছিল না। একটা যা হোক অর্থকরী কাজ জুটিয়ে নেবার জন্য সে অনেকদিন থেকে চেষ্টা কচ্ছিল।

বিমলা বলল—বাবা আজ সকালে তোমার কথা বলছিলেন। কিছু সুবিধে হল?

অবনী বলল—সুবিধে হলে নিজেই বলব। আমি কি করি এ-কথা জিজ্ঞেস করলে মাথা আমার কাটা যায় বিমলা। এতকাল ধ'রে একই প্রশ্নের উত্তর আর দেওয়া যায় না।

—বাবাকে তাহলে কি বলব?

অবনী তার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকালো। তারপর বলল—ব'লো যে অবনীদা দিন কয়েকের জন্যে একটা কাজ পেয়েছিল, কিন্তু সে কাজ ছেড়ে দিতে হয়েছে।

—মিথ্যে কথা বলব?

—হ্যাঁ ব'লো, আমি কিছুদিন চাকরি করে' যে কিছু রোজগার করতে পেরেছিলাম, এটা অন্ততঃ লোককে জানিয়ে আমার মান রেখো বিমলা।

বিমলা করুণ চক্ষে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

অবনীর দিকে চেয়ে থাকতে তার ক্লান্তি আসত না। তার চোখের চাহনিটা বিমলার মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। অবনী কেমন ক'রে চুল আঁচড়ায়, তার ঈষৎ তামার রঙের গোঁফ, মুখের দু তিনটি দাগ, জামার গলার বোতামটা সে লাগায় কি না—এক দৃষ্টিতে নিঃশব্দে তাকিয়ে তাকিয়ে এগুলি সে পর্য্যবেক্ষণ করত!

মনে হতো বিমলার চোখের ভিতর দিয়ে মনটা যেন ছুটে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

অবনীর জন্য লোকনিন্দাকে সে গৌরব মনে করে।

মা-বাপ ছিলেন উদার। অবনী যে বিমলাকে ভালবাসে, একথা তাঁরা নিশ্চয়ই জেনেছিলেন। বাঙালী ঘরের চলতি রীতি

নীতিকে তাঁরা তেমন আমল দিতেন না। এ দুটি তরুণ-তরুণীর সম্বন্ধে কোনো আলোচনায় একটু হেসে তাঁরা চুপ ক'রে যেতেন।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার জমা হচ্ছিল। আস্তে আস্তে বিমলার মাথাটি নিজের কাঁধের ওপর থেকে দু'হাতে তুলে ধ'রে অবনী বলল—চল বাইরে যাই, মাসীমা ডাকছেন।

বিমলা ধড়মড়িয়ে উঠে বলল—চল।

ছাদের আলসেয় ঠেস দিয়ে দুজনে দাঁড়িয়েছিল। একটু আগে গল্প করে' মা নীচে নেমে গেছেন, বাবা আছেন বৈঠকখানায় গড়-গড়া হাতে নিয়ে।

বোধ করি পঞ্চমী তিথি। পশ্চিম দিকে মৃদু চাঁদের আলোয় একটি আবছায়া তৈরী করেছিল। সব বোঝা যায় কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু দেখা যায় না। শরৎকালের হাওয়া বইতে সুরু করেছে।

অবনী বলল—আর আমার চলে না বিমলা।

বিমলা বল্‌ল—কেন?

—না, আর চলে না। নিজেকে বয়ে আর বেড়াতে পাচ্ছিনে, এবার পরের বোঝা বইতে হচ্ছে হচ্ছে। অন্যের নিঃশ্বাসের হাওয়ায় কবে নিজে নিঃশ্বাস নেবো সেই দিনটির কথা ভাবছি। আর আমার দিন চলে না!

বাঁ হাতে বিমলা তার কোমরটা বেড়ে ধরেছিল, অবনীর গলার আওয়াজ শুনে চোখে তার জল এসে পড়ল। ঢোক গিলে বল্‌ল—বিয়ে করতে চাও?

—হঁ্যা, এ ছাড়া আর কোনো উপায়ে নিজের অবস্থার সঙ্গে বোঝা পড়া করতে পাচ্ছিনে।

—বিয়ে ক'রে চালাবে কেমন করে? শ্বশুর বাড়ী থেকে টাকার আশা ক'রে থাকবে?

—না, আমি শুধু ভিক্ষে করবার শক্তিটুকু চাই। স্ত্রীকে খাওয়াবার জন্যে ভিক্ষে করতেও ভাল লাগে।

বিমলা বল্ল—আর কেউ হলে এ কথা শুনে তোমায় পাগল ঠাওরাতো। বিয়ে করবে তুমি ভিক্ষে করবার জন্যে?—না হেসে সে আর থাকতে পারল না।

কথাবার্ত্তা এবং আলোচনা তাদের এমনি করেই হয়। প্রথম প্রেমের প্রলাপ এবং বিকার তাহাদের মাথার ভিতর থেকে কেটে গিয়েছিল। ইতিপূর্ব্বেই তারা যেন স্বামী-স্ত্রীর মত হয়ে গেছে। তাই পরস্পরের সম্বর্কের মধ্যে মাদকতার চেয়ে শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতির ভাবই ছিল কিছু বেশী।

অবনী ডাক্‌ল--বিমলা?

বিমলা মুখ তুল্‌ল।

কি ভাবচ?

—তুমি যা বলছিলে এতক্ষণ। তুমিও পিছিয়ে রইলে, আমিও এগোতে পাচ্ছিনে। যদি তিরিশ টাকা আন্দাজ আয়ও করতে তুমি, তাহলেও আমি সকল দিকের ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারতাম।

কানে কানে অবনী বল্‌ল—আর তার আগে যদি তোমায় বিয়ে করি?

—সে কি! বেকার অবস্থায় পরের দান নিলে যে আমার মাথা হেঁট হবে! যৌতুকের টাকা নিয়ে ঘর বাঁধার চেয়ে গাছ-তলায় দাঁড়ানো ভাল!

অবনী বল্‌ল—মূর্খ নই, আত্মসম্মান সম্বন্ধে দুজনেই আমরা সচেতন, কিন্তু অবস্থা মানুষকে সব চেয়ে বেশি অপমান করে।—যাক্ ও কথা, দারিদ্র্যের কথা ব'লে আজকের এমন সন্ধ্যাটাকে আমরা নষ্ট করব না, এসো।

দুজনে এক জায়গায় এসে বসল। কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত্ত কেটে যাবার পর বিমলা একটু হেসে বল্‌ল—মেয়েগুলো ভারি জ্বালাতন করছে।

অবনী বল্‌ল—আর তোমাদের নতুন দিদি?

—ওর কথা আর ব'লো না। মানুষকে অপমান করেই ওর খ্যাতি।

ঘণ্টাখানেক পরে নীচে থেকে মায়ের গলার আওয়াজ শোনা গেল—অবনী আজ খেয়ে দেয়ে যেও, নেমন্তন্ন কচ্ছি। বিমলা নেমে আয় মা!

দিন পনেরো পরে অবনী একদিন নিজেই এসে খবর দিল, তার একটি মাষ্টারি জুটে গেছে।

বিমলার বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হেসে বললেন ঘটনাটা সত্যি ঘটেছে ত?

অবনীও হেসে জবাব দিল—সত্যি মেসোমশাই, বিশ্বাস না

হয় আপনি ছাত্র সেজে আমাদের ইস্কুলে যান্, আমি আপনাকে পড়াতে যাবো।

মা খুসী হয়ে বললেন—ঘরটা এবার ফিট্ ফাট্ করে' গুছিয়ে ফেলগে।

অবনী বল্‌ল—দোরে আল্‌পনা দেবো নাকি মাসিমা?

দূর থেকে চোখ পাকিয়ে বিমলা তাকে শাসন করে' দিল।

মা বললেন—মঙ্গল-ঘট বসাতে সবুর সইছে না?—সবাই হাসতে লাগল।

আড়ালে ডেকে বিমলা বল্‌ল—মাইনে কত, জিজ্ঞেস করতে লজ্জা হচ্ছে।

অবনী বল্‌ল—দুজনের মন্দ চলবে না, আবার একটা টিউশনি পাবার কথা আছে। সময়টা বোধ হয় একটু ভাল পড়েছে বিমলা।

বিমলা বল্‌ল—ভবিষ্যতের উন্নতির আশা?

—সে অনেক দূর। তোমরা একটা সম্ভাবনা নৈলে থাকতে পারো না দেখছি।

তারপর বিমলাকে কাছে টেনে এনে বল্‌ল—আজকে আর লজ্জা নয়! সবাই জানুক যে তুমিই আমার স্ত্রী!

বাবা আড়ালে ডেকে মাকে বললেন—শাঁখ বাজাতে আর কতদিন দেরি করবে?

—মাস দুই। ছেলেরা রয়েছে বিদেশে, এত সব করবে কে? একটি মাত্র মেয়ে, আমি ঘটা করে' বে' দেবো।

কর্ত্তা বললেন—শতকরা নিরেনব্বই জনের মত হুজুগে তুমি নও জানি কিন্তু—না, বিয়েটা তুমি সেরেই দাও সরোজিনী। ছ'-মাস আগেই আমি ওদের বিয়ে দিতাম, কিন্তু তোমার জন্যেই—

সরোজিনী চোখ পাকিয়ে মুখে হাসি এনে স্বামীর কাছ থেকে উঠে যাবার সময় বললেন—বুড়ো বয়সে তোমার এ অস্থিরতা কেন? মেয়েরও অধম!

কর্ত্তা হাসলেন। বললেন—কাছের দৃষ্টিতে চালসে ধরে' দূরের দৃষ্টি গেছে বেড়ে। অতীতের দিক থেকে ভবিষ্যতের দিকে ফিরেছি। বুঝলে? ফুলের চেয়ে এখন ফলাফলের দিকেই বেশি নজর। তুমি চোখ খুলে থাকো তাই অনেকটা দেখতে পাও, আমি চোখ বুজে থাকি তাই দেখতে পাই সমস্তটা।

মা ভিতরে চলে গেলেন। হেঁয়ালী তিনি ভাল বাসেন না! বলে গেলেন—তুমি বেশী বুদ্ধিমান!

আত্মীয় স্বজন অবনীর বিশেষ কেউ ছিল না, সুতরাং হঠাৎ একদিন এক পিসিমা আবিষ্কৃত হয়ে এলেন। অনেক ভাঙাচোরা ছিল অবনীর জীবনে, সেগুলি একে একে মেরামত করা চলতে লাগল। সময়ের হিসাব, নিয়মের আনুগত্য—ঘড়ির কাঁটা ধ'রে চলতে লাগল। রাত করে' বাড়ী ফিরে কৈফিয়ৎ দিতে তার আনন্দ হতো। ছোট ছোট তিরস্কারকে সে হেসে হেসে মাথা পেতে নিতে লাগল। পিসিমার মায়া মা'র চেয়েও কিছু বেশি।

একদিন বিবাহের ঠিক হলো।

চেনা ও জানা

বাজারে ঘুরে ঘুরে অবনী নানা রকম সৌখীন জিনিসপত্র কিনতে বেরোলো। বন্ধু বান্ধবদের শুভ সংবাদ দিয়ে এল। গৃহ সজ্জার নানা উপকরণ এসে জমা হতে লাগল—বিমলা এসে যখন সমস্ত গুছিয়ে রাখবে, অবনী তখন অনাহূত মধুর সমালোচনা সুরু করে' দেবে। এবং বিমলা যে কেমন করে' চোখ রাঙিয়ে তাকে তিরস্কার করবে সেই কথা ভেবে সে একেবারে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

মালা-বদলের দিনটি আসন্ন হয়ে এসেছে। অবনী তার একটি বন্ধুকে দিয়ে সরোজিনীকে চিঠি লিখে পাঠালো—'মাসিমা, নিজে যেতে ইচ্ছে হ'ল না কারণ উৎসবের বাঁশী আমাকে লক্ষ্য করে' বাজতে সুরু করায় নিজেকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে হচ্ছে। দূত পাঠালাম, টোপর মাথায় দিতে হ'লে আর কি-কি প্রয়োজন হয় লিখে পাঠাবেন। পিসিমার মমত্ববোধ আছে কিন্তু অভিজ্ঞতা নেই।'

আধঘণ্টা খানেক পরে বন্ধুটি আবার ফিরে এল। মুখ তার পাণ্ডু, শুষ্ক। মাথা হেঁট করে' এসে দাঁড়াল।

—কই দেখি কি লিখলেন মাসিমা? বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ছিলি অমরেশ?

অমরেশ জীবনে বুদ্ধির চাষ করেনি। বোকার মত বল্‌ল—হুঁ, তারপর বাইরে দাঁড়াতে বললেন।

—বাইরে? আমার বন্ধুকে—প্রথমে চিন্‌তে পারেনি বুঝি? চিঠি দিয়েছিলি?

—হুঁ, চিঠি হাতে নিয়ে তিনি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন।

অবনী হঠাৎ দু' তিনবার কাশল। তারপর অবিশ্বাসের সুরে হাসবার চেষ্টা করে' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বল্‌ল—কেন? অপরাধ?

অমরেশ চুপ করে' রইল।

অবনী অধীর হয়ে বল্‌ল—কি বললেন কি, শুনি?

অমরেশ একবার এদিক ওদিক তাকালো। পরে বল্‌ল—ফিরে এসে আমাকে অপমান করে' তাড়িয়ে দিল।

গায়ে জামাটা চড়িয়ে অবনী পথে নেমে পড়ল। মিনিট পনেরোর রাস্তা। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে সদর দরজায় ঢুকে দালানের কাছে এসে ডাক্‌ল—মেসোমশাই?

উত্তর নেই। আরো খানিকটা এগিয়ে এসে—এই যে মাসিমা, আমি এলাম—ব'লে সে কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কয়েকটি অবরুদ্ধ মুহূর্ত্ত, তারপরই সরোজিনী ফেটে চৌচির হয়ে উঠলেন—লজ্জা করে না? ও-মুখ নিয়ে সদর দরজার কাছ থেকে এ-পর্য্যন্ত আসতে পা কাঁপ্‌লো না?

অবনী কি একটা প্রশ্ন করবার চেষ্টা করতেই তিনি আবার চীৎকার করে' উঠলেন—স্বাধীনতাকে এমনি করে' পায়ে থেঁৎলাতে হয়? তুমি না লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকের ছেলে?

মনে হলো এতদিনকার সমস্ত স্নেহ-মমতা মাসিমার নিঃশেষে মুছে গেছে।

—যাও, গোবর-জল দিয়ে এ-বাড়ী থেকে তোমার পায়ের দাগ মুছে ফেলবো—চলে' যাও।

অবনী মাথা হেঁট করে' বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় নেমে কয়েক পা সে যখন এগিয়েছে এমন সময় তার পায়ের কাছে সুতো-বাঁধা একটি গুলি-পাকানো কাগজ এসে পড়ল। হেঁট হয়ে সেটা তুলে নিয়ে ওপর দিকে তাকাতেই জানলার কাছ থেকে বিমলা তাড়াতাড়ি মুখ লুকিয়ে ভিতর চলে' গেল।

এই প্রকাণ্ড শহরের আনাচে কানাচে উন্মাদের মত অবনী ঘুরে বেড়াতে লাগল। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় কে যেন তাকে চাবুক মারতে মারতে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছিল। চোখে তার নিদ্রা ছিল না, বিশ্রাম ছিল না, আহার ছিল না। বিবাহের এত বড় আয়োজন তার মাথা থেকে ধেঁায়ার মত মিলিয়ে গিয়েছে। লক্ষ টাকা দিলেও জনসমাজে মুখ দেখাবার তার আর উপায় নেই। সে সমাজদ্রোহী নীতিজ্ঞানহীন, তার প্রতি অন্যের বিশ্বাসকে সে চিরদিনের মত অপমান করেছে। রাস্তায় চলতে গেলে প্রত্যেকটি মানুষ তার দিকে আঙুল দেখিয়ে ছি ছি করে' যাবে। কোথাও বসে কিছু ভাবতে তার ভয় করে। পিসিমা কিছুই জানেন না, তবুও তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে তার মাথা কাটা যাচ্ছিল।

অনেক রাতে লুকিয়ে সে ঘরে এসে ঢোকে। অন্ধকারে বসে থাকলে শত শত দৈত্য-দানব যেন তাকে তাড়া করে' আসে। আলো জেলে নিজের মুখ প্রকাশ করতেও তার ভয় করে। ঘরের মধ্যে সে তিষ্ঠতে পারে না, মনে হয় ঘরখানা ক্রমশঃ ছোট হয়ে তাকে যেন চেপে মেরে ফেলতে চাইছে; বাইরে গিয়ে মনে হয়

কুৎসিত রাক্ষসীর মত সেই ভয়াবহ চিন্তাটা ধারালো নখে তাকে আঁচড়াবার জন্য এগিয়ে আসছে। তার মুক্তি নেই, শান্তি নেই, আনন্দ নেই—সমস্ত জীবন তার কাছে ব্যর্থ, রুক্ষ, মরুভূমির মত হয়ে দেখা দিল।

একদিন অবনী স্থির করল, সে আত্মহত্যা করবে।

গঙ্গার জলে গিয়ে ডুবতে তার ইচ্ছা হল না, লোকে তুলে বাঁচাতে পারে। আগুনে পুড়তে গেলে ধোঁয়ার গন্ধে লোক ছুটে আসবে। গাড়ী চাপা গেলে হাঁসপাতাল থেকে বাঁচিয়ে আনবে। ছাত এমন কিছু উঁচু নয় যে, মাটীতে পড়লে মৃত্যু হবেই। হয়ত হাত-পা ভেঙে বেঁচে উঠবে! সে তখন ঠিক করল, বিষ খাবে।

বাস্, অমনি সে পয়সা নিয়ে বাজারে ছুটলো। আফিং আনলো, তার সঙ্গে কিছু দড়ি। বিষ খেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে' থাকবে।

বাড়ী এসে রাতের বেলা অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকে অবনী দরজাটা বন্ধ করে' দিল। তেলের সঙ্গে সে প্রথমে আফিং গুললো। তারপর একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে কড়িকাঠের আংটায় বেশ করে' পাকিয়ে দড়ি বাঁধলো। আঃ মৃত্যুর এমন চমৎকার পন্থা যে সে এত সহজে আবিষ্কার করতে পেরেছে এজন্যে নিজের প্রতি শ্রদ্ধায় এবং কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে' উঠল। তারপর টুলের ওপর বসে বিষের পাত্রটা হাতে তুলে নিয়ে তার মনে হলো—বিমলা!

সর্পাহতের মত উঠে তাড়াতাড়ি বিষের বাটিটা নিয়ে সে

জান্‌লা গলিয়ে তৎক্ষণাৎ রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিল। এ কাপুরুষ-তাকে সে প্রশ্রয় দিয়েছিল কেমন করে'?

জানলা দরজা খুলে দিতেই বাইরের হাওয়া ঢুকলো। সে তখন আলো জ্বেলে কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসলো। চিঠি শেষ করে' খামে পুরে ঠিকানা লেখে সে যখন রাস্তায় নেমে গিয়ে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে বাড়ী ফিরে এল, রাত তখন আড়াইটে।

সে রাতে ঘুমিয়েছিল সে নিশ্চিন্তমনে।

যথা সময়ে সে পত্র বিমলার হাতে গিয়ে পড়লো। খোলা একখানি বেয়ারিং চিঠি।

তিনটি দিন এবং তিনটি রাতের পর—

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রে আকাশ সেদিন ভেঙে পড়েছিল। অশ্রান্ত বৃষ্টিধারার আর বিরাম ছিল না। জলো হাওয়া বইছে হু হু করে'—তার সঙ্গে মেঘের গর্জ্জন।

থান দুই কাপড় পুঁটলির মত করে' পাকিয়ে হাতে নিয়ে বিমলা চোরের মত নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল। বাড়ীর সবাই তখন ঘুমে অচেতন। মেঘ-মেদুর আকাশের দিকে সে একবার তাকালো,—রাস্তা ঘাট জলে জলে চক্‌চক্ করছে। গলা বাড়িয়ে উঁকি মেরে সে একবার দেখল, পথে জন মানবের চিহ্নমাত্র নেই। বর্ষায় চারিদিক ধু ধু করছে। না, আর দেরি নয়। পিছন দিকে একবারটি তাকিয়ে সে তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে পড়ল।

অলি গলি পার হয়ে সে বড় রাস্তায় এল। সামনেই ডাকঘর, তারপর ছেলেদের ইস্কুল, সেটা পার হয়ে খানিকটা গিয়ে কালীবাড়ী, তারপর আর খানিক এগোলেই বাজার। বাজারের পর ট্রামডিপো, সেটা পার হয়ে বড় বাগানটার দক্ষিণ-পশ্চিম ফটকে সে এসে দাঁড়াল।

অবনী ভূতের মত কোথায় অপেক্ষা করছিল, এগিয়ে এসে বিমলাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে প্রায় চীৎকার করে' উঠেছিল আর কি! বল্‌ল—অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি। রাত দেড়টার গাড়ী, এসো। ওই যে আমাদের গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে!

দুজনে খানিক এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে সাড়া এল—দাঁড়াও হে, একটু দাঁড়াও অবনী।

ভয়ানক চম্‌কে উঠে ফিরে তাকিয়ে অবনী দেখলো, মেসোমশাই!

মেসোমশাই এগিয়ে এসে খুব কাছে দাঁড়িয়ে বললেন—আগে ক্ষমা চেয়ে নিই, তোমাদের চিঠিখানা খুলে' আমাকে পড়তে হয়েছিল অবনী, কারণ ওটা একবারটি পড়া দরকার। আমি আসছিলাম এতক্ষণ তোমার স্ত্রীর পেছনে পেছনে। দেখলাম, পথ সে হারাল না!

অবনী কম্পিত কণ্ঠে বল্‌ল—মেসোমশাই—

তিনি বললেন—কিন্তু তুমি একটু ভুল করলে। তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা তেমন ভাল নয় নৈলে একটা ভাল পথ

বাৎলে দিতাম—যাক্। তবু চাকরিটা ছাড়বার আগেই ভবি-ষ্যটা ভাবলে পারতে। আমি শুধুই বুড়ো নই, বার্দ্ধক্যটা পার হয়ে এ-কালেও অনেকটা এগিয়ে এসেছি। যে ঘটনাটা তোমাকে নিয়ে আমার পরিবারের মধ্যে ঘটে গেল এটা অত্যন্ত পুরোনো। পুরোনো বলেই এটা নতুন। এর গতিতে বাধা দিলে চলবে না, সাহায্য করতে হবে। ভালবাসাকে সইবো অথচ তার ফলাফলটাকে বাদ দেবো এত বড় অবিবেচনা আমার নেই। এই নাও, হাত পাতো—এই যা দিচ্ছি, এর [illegible] আপাতত তোমাদের চলবে। কাজ একটা কিছু ক'রে নৈলে তোমাদের সম্পর্কের ভেতর থেকে ফেনা উঠবে!

রুদ্ধকণ্ঠে বিমলা বল্ল—বাবা!

—চুপ কর মা, তোমার সঙ্গে কথা বল[illegible] দিন আমার চলে' গেছে।—না না, প্রণাম [illegible]নে, আমি [illegible] [illegible]নো দলের লোক, অবিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর প্রণাম নিয়ে ন্যায়রত্ন:দের অপমান করবো না!—এবার তোমরা এসো গে। কোথা[illegible] চললে এ আমি আর জিজ্ঞেস করব না। কিন্তু যতদূরেই যাও, আমার আশীর্ব্বাদ যাবে তোমাদের পিছনে পিছনে—আসি তবে।

পিছন ফিরে বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি চলতে লাগলেন। শ্রাবণ-রাত্রির আকাশ থেকে তখন আবার ঝর ঝর করে' বৃষ্টি নেমে এসেছে।

ছায়াবাজি

ছোট শহরটির সীমান্তে,—কি একটা অখ্যাতনামা ইষ্টিশানের কাছাকাছি।

জল-হাওয়া বোধ হয় একটু ভালই। পূজা-পর্ব্বে তাই চাকুরে বাবুদের ভিড় লাগে। সেবার বড়দিনের ছুটিটাও বাদ গেল না।

ছুটি মাত্র দিন দশেকের। এই কটা দিনকে উত্তমরূপে কাজে লাগিয়ে নেওয়া চাই। দেশে ফিরেই ত আবার সেই ঘানি-টানা! জল্পনাতেই দুদিন গেল। তৃতীয় দিনে তবু যাহোক্ একটি মিলন-কেন্দ্র ঠিক হল।

আড্ডা দিতে দয়া করে অনেকেই আসেন। কুড়ি বছরের কাঁচা কেরাণী থেকে আমাদের অবসর প্রাপ্ত ডেবুটি যোগীনবাবু পর্য্যন্ত। আড্ডাটি যে উঁচুদরের তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই এবং দুটি জিনিস ছাড়া যে কোনো বিষয় নিয়েই সেখানে আলো-

চনা চলতে পারে—রুচি-বিরুদ্ধ কোনো কথা ও নীতি-বিরোধী কোনো কাজ !

বেশ তাই তাই। মাত্র আটটা দিন বৈত' নয়! শীতটা সে দিন দিন সত্যি সত্যিই একটু বেশী মাত্রায় পড়ে গিয়েছিল। উত্তুরে হাওয়া কি—যেন একরাশ ছুঁচ। এর ওপর ঝমঝমে বৃষ্টি যোগ দিয়ে সন্ধ্যের আগে থেকেই ভারি পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। ঘর-দোর ইন্দি-ছিন্দি বন্ধ করেও শীত-কাতর বাঙ্গালী-দেহের কাঁপুনি যেন আর থামতেই চায় না। বাইরের জমাট নিশুতি রাত্রি একাকার করে একটানা সুরে শ্রাবণের ধারার মত তখন অবিরল বর্ষণ হচ্ছিল।

বাইরের ফাঁকা মাঠের হাওয়া লেগে দরজাটা মাঝে মাঝে সশব্দে নড়ে' উঠছিল। ঠিক অমনি কোন্ এক সময় দরজা ঠেলে তাড়াতাড়ি একটি লোক ঘরে ঢুকে পড়ে বললে—অরাজক আর কাকে বলে! দেখছেন মশায় দেখছেন একবার, গরীবের উপর অত্যেচারটা একবার দেখছেন?

অকস্মাৎ লোকটির এমন অনধিকার প্রবেশে সকলেই একটু চমকে উঠেছিল। নরেনবাবু একটু সাহসী, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দিন কয়েকের জন্য তিনি সৈন্য বিভাগের দপ্তরে কেরাণী-গিরি করেছিলেন। প্রয়োজন হলে তাঁর মিলিটারি রোক্ এখনও মাঝে মাঝে চেপে ধরে।

বললেন—কে মশাই আপনি? কি চান্?

লোকটি কথাটা গ্রাহ্যই করলে না। ভিতর থেকে দরজাটা

বন্ধ করে সকলের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললে—আপনারা সকলেই বাঙালী দেখছি। ভারি খুসি হলাম।

তাউইমশাই ধার্ম্মিক লোক। বললেন—আহা বসুন, বসুন এই চৌকির ওপর ভাল করে। বিদেশে কোন বাঙালীকে দেখলেই মনে হয় কতকাল ধরে' যেন চেনাচিনি। আপনি কোথা থেকে আসছেন?

—আর মশাই দুর্ভোগ, কেন আর বলেন। শহরে গিছলাম ডাক্তার বাড়ীতে। জগত-গঞ্জের মাঠ পেরোতেই দেখছেন না ঝড় বৃষ্টিতে একেবারে ওলোট-পালট হয়ে গেলাম!

বিভাস ছেলেটি ভাব-প্রবণ. কবিত্বময় এবং দরদী। সে বললে, ভিজে গেছেন একেবারে, ছুটতে ছুটতে এলেন বুঝি?

লোকটা বললে—এখনও যে হাপাচ্ছি—বুঝতে পেরেছেন, না? যদি না ছুটি এই বৃষ্টিতে......কাশির রোগ আছে মশাই বুঝলেন ত?—বলে সে হঠাৎ কাশতে সুরু করে দিল।

যাই হোক, কী আর হবে! বাঙালীর কাছে বাঙালী এসেছে, অনাদরও করা চলে না। তাউই-মশাই তখনই তার জন্য গরম দুধ, মোহন ভোগ, এক পেয়ালা চা আর পানের ব্যবস্থা করে দিলেন।

অর্থনীতিক অমরেশবাবু একটু কৃপণ। তাই তিনি ঠিক সময়টি বুঝে একটি সিগারেট বার করে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নিন্, ধরান্। ভারি ঠাণ্ডা! কিন্তু আমাদের অকর্ম্মণ্য দেশের পক্ষে এমনি জল হাওয়াই দরকার! ঠাণ্ডা না হলে পরিশ্রম করা চলে

না, আর পরিশ্রম নৈলে পয়সা রোজগারও—। দেখুননা বিলেতের ওরা—

ডেপুটি যোগীনবাবু বিলাতের নাম শুনেই এবার কথা বলবার সুযোগ পেয়ে গেলেন। গড়গড়ার নল থেকে মুখ তুলে বললেন—তা নয় মশাই তা নয়। আমাদের এই অলস বাঙালী জাতটা হচ্ছে কুণো ব্যাঙ। এদের স্বভাব হচ্ছে ম্যালেরিয়ায় ভোগা আর কাজ হচ্ছে পরনিন্দা। কোনো দিন কি এরা উন্নতি করতে পারবে ভেবেছেন? ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের ক্যালেণ্ডার ঘাঁটুন, দেখবেন মাদ্রাজিরা আজ কাল কি রকম—

সুযোগ পেলেই যোগীনবাবু এমনি ভাবে স্বজাতিদের ভূলুণ্ঠিত করতে ছাড়েন না।

অরুণ বাবু অনেকদিন বেকার থাকবার পর চাকরি পেয়েছেন। সুতরাং আধুনিক শিক্ষা, দীক্ষা, সমাজ রাজনীতি প্রভৃতির ওপর তিনি মর্ম্মান্তিক চটা! একদিকে তিনি যেমন সমাজবিপ্লবী সাম্য-বাদী, অন্যদিকে স্বজাতির নিন্দা তিনি এতটুকু সহ্য করতে পারেন না। যোগীনবাবুর কথায় ফস করে জ্বলে উঠে বললেন—আমি বরং মুটে মজুরের কাছ থেকে দেশের নিন্দে সহ্য করতে পারি কিন্তু রায়সায়েব কিম্বা ডেপুটির কাছ থেকে দেশের সম্বন্ধে খোঁটা শোনা—অবশ্য যোগীনবাবুকে আঘাত করবার জন্যে আমি একথা বলছিনে।

বিভাস বলে উঠলো—দেশকে আমরা ভাল করে কেউই জানিনে। শিক্ষা, সভ্যতা, সমাজ রাজনীতি কিম্বা আজকের এই

নবজাগ্রত তরুণের দল—ঠিক এদের ভেতর দিয়ে দেশকে দেখলে ভুল করা হবে। দেশকে দেখতে হবে চোখ বুজে ভাবের দিক দিয়ে। রবিবাবুর কথায় আমাদের দেশ সত্যিই ভুবন-মন-মোহিনী! পায়ের তলায় নীল জল, মাথায় সোনার কিরীট, পূর্ব্ব প্রান্তে—

অমরেশ বাবু তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—ওসব চলবে না, বুঝলে বিভাস? আজকের যুগে আর যাই চলুক—কোনো সেণ্টিমেণ্টাল্ আলোচনা চলবে না; আমাদের সবাইকেই নিতান্ত স্পষ্ট হতে হবে। এখনকার সব চেয়ে বড় সমস্যা হলো কেমন করে আমরা বাঁচবো!

আগন্তুক লোকটি চুপ করেই এতক্ষণ বসে ছিল। শেষের কথাটা শুনে হঠাৎ সে যেন সজাগ হয়ে উঠলো। একটু নড়ে চড়ে তার আরক্ত চোখ দুটো তুলে বললে—ঠিক বলেছেন, সব চেয়ে বড় সমস্যা—না, একে সমস্যা বলে ছোট করবো না—আমাদের অহোরাত্রের চিন্তা হলো কেমন করে আমরা বাঁচবো! যে দিকে দেখছি, সবাই যেন মৃত্যুর দিকে ছুটে চল্‌চে। আজ পর্য্যন্ত মানুষ যা কিছু ভেবেছে, যা কিছু কাজ করেছে, যা কিছু আবিষ্কার করেছে —সমস্তই তার নিশ্চিত মরণযাত্রার সহায় হয়ে উঠেছে।

তাইত! এ লোকটি এতক্ষণ চুপ করেই ছিল যে! নিতান্ত সাধারণ মানুষটি সহসা সকলের মাঝখানে কেমন করে যেন [illegible]শিষ্ট হয়ে উঠলো। যোগীন বাবু মুখ থেকে নলটা নামালেন; সৈনিক নরেনবাবুর রোক্ উবে গেল। অর্থনীতিক অমরেশ বাবুর কথার সূত্রটা যে এমনি ভাব-প্রবণতার পথ ঘেঁসে চললো—এজন্যে ক্ষুণ্ণ

চয়ে তিনি এদিকে চেয়ে রইলেন। তাউই মশায়ের একটু আফিং খাওয়ার অভ্যাস, তিনি তাই চোখ বুজে ঘাড় হেঁট করে রইলেন। বিভাস তখন বোধ করি মনে মনে আওড়াচ্ছিল—

'নীল সিন্ধু-জল, ধৌত-চরণ তল।'

বাইরে বর্ষণ-ধারার শব্দ তখনও থামেনি। আহত দস্যুর মত গোঁ-গোঁ করে' হাওয়া বইছিল।

একটু থেমে লোকটি বল্‌লে—আজকের পৃথিবীতে ভগবান মিথ্যে হয়ে গেছে, মানুষ তার মনুষ্যত্ব একেবারে ভুলে গেছে। তাব্দীর সভ্যতা হয়ে উঠেছে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। এ কন বলতে পারেন?

সমাজ-বিপ্লবী অরুণ এবার ভয়ানক জোরে মাথা চাড়া দিয়ে ঠলো। বললে—এ শুধু সাম্রাজ্যলোভীর পাপে, বুঝলেন? আমার মনে হয় প্রত্যেক ব্যক্তিকে আজ সমান অধিকার দিতে বে। সাম্যবাদই হচ্ছে আজকের যুগে বাঁচবার সব চেয়ে বড় পায়। এর মধ্যে কোনো ভাবের ঘোর নেই!

লোকটি একটু হেসে বললে—মানুষকে স্বাধীনতা দিলেই যে ন বড় হয়ে উঠবে, এ ভুল আপনাদের ভেঙে যাওয়া দরকার। মানুষ বাঁচে মানুষের প্রীতির মধ্যেই। শিক্ষা, সভ্যতা এবং জ্ঞান তিনটিই এ যুগের সব চেয়ে বড় মূলধন। কিন্তু একটি বস্তুর ভাবে আজও এরা সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। সে হচ্ছে মানুষের প্রতি মানুষের সহজ প্রেম। জীবনের প্রতি একান্ত মমতা।

অমরেশ বাবু এবার ভুরু কুঁচকে অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন —কিছু মনে করবেন না, এবার আপনাকে বেশ বুঝতে পেরেছি। ঐ প্রেম জিনিষটি হচ্ছে একেবারে ধোঁয়া। হ্যাঁ স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধে যদি ওটা বলতেন তা হলেও না হয়—

বিভাস এতক্ষণ বোধ করি সিন্ধু-জলে সাঁতার কাটছিল। সে বলে উঠলো—অমরেশ বাবুর কাছে চক্‌চকে চাকৃতি ছাড়া বাদবাকি জগৎটাই হচ্ছে নিতান্ত ধূম্রময়ী!

অমরেশ বললেন—বিভাসচন্দ্রের চোখের কাজল আজও মোছেনি দেখছি।

বিভাসের বদলে ওই লোকটিই উত্তর দিলে। বললে—এটা চোখের কাজল নয়, এ হচ্ছে সত্যিকারের কাল্‌চার। আমরা বস্তুজ্ঞানের অস্ত্র দিয়ে কাল্‌চারকে হত্যা করেছি। স্বাধীনতা মরেছে সভ্যতার পায়ের তলায়। আজ বাইরের চেয়ে নিজেদের দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। আত্মবিশ্লেষণই হচ্ছে আমাদের এই পৃথিবীব্যাপী হত্যাশালা থেকে মুক্তি পাবার উপায়!

অমরেশ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। বল্‌লেন—প্রেমকে আপনি কি রকম ভাবে নিতে চান্?

লোকটি বললে—প্রেম হচ্ছে জীবনের একমাত্র অবলম্বন। এ'কে না হলে কারো চলবে না। জীবনের প্রকাণ্ড বৃক্ষ এই বস্তুটি থেকেই রস টেনে নিজেকে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত-প্রসারিত করে দেয়। একে বাদ দিয়ে চল্‌লে বেঁচে থাকার কোনো সার্থকতাই নেই।

শেষ কথাটির ওপর এত জোর পড়লো যে সকলেই একবার খ তুলে চেয়ে দেখলেন।

লোকটি বলতে পারে ভালই কিন্তু সব জড়িয়ে তাকে তেমন াল লাগে না। অবিন্যস্ত জটার মত এলোমেলো কতকগুলো াথার চুল, শুকনো চেহারা, চোখদুটো লাল, দাড়ি গোঁফে মুখ-ানা একাকার ; চেহারাটা যেন হতশ্রী! লোকের সহানুভূতির চয়ে সন্দেহই যেন বেশী আকর্ষণ করে।

ডেপুটি যোগীনবাবু নলটা মুখ থেকে নামিয়ে গড়গড়াটা সরিয়ে রখে নিঃশব্দে ভিতরে চলে গেলেন। বুড়ো হয়েছেন,—প্রেমের ালোচনা তিনি এখন আর সইতে পারেন না।

ভাউইমশাই বলে উঠলেন—আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেলে াল করতে, বুঝলে বেয়াই?

বেহাই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বললেন—তুমি বসে াকো হে। আফিঙ খেতে ভালবাসো, গাঁজাখুরি কথাগুলোও াই সঙ্গে ভাল লাগবে।

সমাজবিপ্লবী এবং দেশভক্ত অরুণ অবজ্ঞার হাসি হেসে বললে —যোগীন বাবুর জীবনে সব চেয়ে বড় দুঃখু হলো ওঁর মা বাপ কেন বিলেতে জন্মাননি।

কিন্তু তার কথাটা কোথা দিয়ে কেমন করে যেন ভেসে গেল। াবাগত লোকটির শেষ কথাটা তখনও যেন ঘরের চারিদিকে দয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সকল কথার াড়ালে কি যেন একটি গভীর কথা সে বলতে চায়! আজকের এই

অন্ধকার দুর্য্যোগের রাতে তার জীবনের কোন্ মূক একটি বেদনাকে হয়ত' সে এই অপরিচিত অজ্ঞাত আলাপীদের কাছে ভাষায় বেঁধে দিয়ে যেতে চায়,—এই কথাটিই ক্ষণে ক্ষণে সকলের মনে হচ্ছিল।

অমরেশ বললেন—আপনি যার কথা বলতে চান সে রকম প্রেম ত পৃথিবীতে নিতান্তই অসম্ভব বস্তু। তা নিয়ে স্বপ্ন দেখাই চলতে পারে, সত্য হয়ে উঠতে পারে কি কোনো দিন?

পারে!—লোকটি বললে—আমরা আকাশে উড়তে পারি, জলের তলায় যুদ্ধ করতে পারি, গাছের হাসিকান্না আবিষ্কার করতে পারি, এত বড় শক্তি আমাদের রয়েছে—কেবল মানুষকে ভালবাসবার শক্তিই আমাদের নেই?

অরুণ বললে—আছে, নিশ্চয়ই আছে। আছে বলেই আমরা আজও সেই শক্তির কল্পনাও অন্তত করতে পাচ্ছি।

বিভাস বললে—জগতটা হচ্ছে শুধু আনন্দের প্রকাশ, আনন্দ থেকেই আমাদের উদ্ভব এবং পরস্পরের প্রীতিই যে আনন্দের স্বরূপ—এই ভাব, এই স্বপ্নও আমাদের ভুললে চলবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই ভারত একদিন—

চুপ কর হে, চুপ কর—অমরেশ তাকে আবার থামিয়ে দিলেন—তোমার ভাব-রসের রসিক সকলেই নয়। জমীদারের ছেলে তুমি, কত ধানে কত চাল ত আর জানো না হে!—আচ্ছা আপনার কথাই আবার বলুন শোনা যাক্। আপনার নিজস্ব যে একটা কাল্চার আছে এ কথা আমি মেনে নিচ্ছি। জীবনে বোধ হয় অপনি দুঃখ পেয়েছেন খুব, কি বলেন?

লোকটি একটুখানি হাসলে। এ হাসির মধ্যে কোথায় যে-
টি সুনিবিড় বেদনা লুকিয়ে আছে, কিম্বা এ হাসি সংসারের
ন্ত উদ্বেগের প্রতি প্রচ্ছন্ন একটি বিদ্রূপের প্রকাশ, অথবা এ
সটুকুর মধ্যে নিজের প্রতি কোনো অনুকম্পা ছিল কি না,—
চুই বোঝা গেল না।

তাউই মশাই শুধু একবার ঘাড় তুলে আবার হেঁট করে
লেন। তিনি ধর্ম্মালোচনার অপেক্ষায় কাল যাপন কচ্ছিলেন।

লোকটি বললে—কিছুই না। সত্যকারের দুঃখের কি কোনো
রা আছে আপনি বল্‌তে চান্‌?

সে কি! নেই? এই যে সংসারে এত—

আবার হেসে লোকটি বললে—সংসারে অনেক দুঃখই
ছে; যার অন্নবস্ত্র নেই, অর্থ নেই, যার স্বাধীনতা নেই,
আশ্রয় নেই, তার জীবন হয়ত শুধু বিধাতার রসিকতা।
ন্তু আমি এদের মোটেই দুঃখ বলি না। নৈলে—

অমরেশ বলে উঠলেন—ক্ষমা করবেন, এক মিনিট আগে
পনাকে হঠাৎ একটু ভুল বুঝেছিলাম। আপনি যা বলছেন
যে শুধু আমরাই বুঝিনে তা নয়, আপনি নিজেও এ সম্বন্ধে
বোঝেন না। অবশ্য আজকের ঠাণ্ডায় বাদলায় আপনার
ালী যে একেবারেই খারাপ লাগছে তা নয়; কিন্তু
াপড়া আমরাও কিছু কিছু জানি, একটু ভেবে চিন্তে বললে
হই।

সমাজতন্ত্রবাদী এবার চট্‌ করে অর্থনীতিকের দলে ভিড়ে

গেল। বললে—সত্যিই তাই। অর্থপিশাচ ধনিকেরা আজ সর্ব্বত্র যে মানুষের টুঁটি টিপে রক্ত খাচ্ছে, সাম্রাজ্যলোভীরা পরাধীন জাতীকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে যাচ্ছে,—এরা যে সব দুঃখের সৃষ্টি করেছে সেগুলো কিছুই না, আর মানুষের সামান্য কল্পনার সৌখীন চিন্তা, সেই হবে দুঃখের বিশ্লেষণ? এ সত্যই দুঃখের কথা।

লোকটি বললে—মার্জ্জনা করবেন, এসব আমার কথা মাত্র। আপনাদের কাছে যে এর কোনো দাম হবে এ সন্দেহও আমার নেই। তা ছাড়া এ আমার মতামতও নয়। মনে আসচে তাই বলে যাচ্ছি, কাল হয়ত অন্য কোথাও ঠিক এর উলটো কথাই বলবো।—পরে একটু হেসে বললে—আমার একটা গুণ আছে, আমি প্রতিদিন নিজেকে আবিষ্কার করতে পারি।

বিভাস এবার একটু সরে এসে বসলো। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে শু বললে—আপনার নাম কি?

নাম? আমার নাম সিদ্ধেশ্বর পাঠক। কেন বলুন ত?

আপনার মত লোকের দেখা পাওয়া সৌভাগ্য!

অমরেশ তখন উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একদিকে চেয়েছিলেন এবার বললেন—আপনার সমাজ নেই, প্রচলিত সংস্কার আপ মানেন না, আপনার কোনো ধর্ম্ম নেই, দুঃখটাও আপনার কা একটা বাজে কথা।

সিদ্ধেশ্বর বললে, বাজে কথা ত বলিনি। আমি বলতে চা জগতে সব চেয়ে বড় দুঃখ হচ্ছে, নিজের সম্বন্ধে ভয়ানক চেতনা এ যে জীবনের কত বড় ব্যথা—

অমরেশের মাথা আবার গোলমাল হয়ে গেল, কৌতূহল দমন করে বললেন—এ আপনি সত্য বলচেন ?

অরুণ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। হঠাৎ অমরেশের প্রশ্নটাকে চাপা দিয়ে বললে—নরনারীর প্রেমের ব্যাপারেও বোধ হয় আপনার কোনো বিশ্বাস নেই ?

রাত ওদিকে অনেক হয়ে গেছলো। তাউই মশাই কি জানি কেন, এতক্ষণ মাঝে মাঝে উস্‌খুস্‌ কচ্ছিলেন।

সিদ্ধেশ্বর হেসে বললে—নেই বললেই ত আমার পক্ষে ভাল হতো। আর প্রেম বলে সত্যিই যে কোনো বালাই নেই, এই কথাই আমি সকল দিকে প্রচার করতে চাই। বিশেষতঃ নরনারীর সম্বন্ধে এত বড় মিথ্যা, এত বড় ফাঁকা কথা বোধ হয় আর কিছু নেই।

বিভাস কাতর হয়ে বলে উঠলো—সে কি দাদা, এ আবার আপনি কোন্ পথে ছুটচেন ? আপনার জীবনে প্রেম কি একেবারেই বাজে কথা ? সত্যিই কি সেখানে প্রেম নেই ?

সিদ্ধেশ্বর শেষের প্রশ্নটিতে একেবারে যেন হতচকিত হয়ে গেল। উড্ডীয়মান পাখীর ডানা কেটে নিলে তার যে অবস্থা হয়, সেও তেমনি যেন হঠাৎ ভূলুণ্ঠিত হয়ে অসহায় ক্লিষ্ট, আচ্ছন্ন কণ্ঠে বলতে লাগলো···আছে ভাই; আছে বলেই তাকে এত বড় আঘাত করতে সাহস করি! আচ্ছা, রাত এগারোটা বাজতে একটু দেরী আছে, কি বলেন? প্যাসেঞ্জার গাড়ীখানা কখন্ ছাড়ে কে জানে!

অমরেশ বললেন—খানিকটা দেরী আছে বটে ছাড়তে।

বিভাস বললে—তা থাকুক, আপনার প্রেমের গল্প না শুনে আপনাকে যেতে দেওয়া হবে না। বলুন!

এক অত্যাশ্চর্য্য বিয়োগান্ত প্রেমের গল্প সিদ্ধেশ্বর সুরু করে' দিল। কিন্তু গল্পটি প্রায় যখন শেষ হয়ে এসেছিল তখন হঠাৎ ওপাশের জানলার ধারে অনেকগুলো লোকের গলার আওয়াজ শোনা গেল।—

বাবুজি?—বাবুসাহেব?

সকলে চমকে উঠে জানলার দিকে চাইলে। তাউই মশাই আঁৎকে উঠে বললেন—কোন্ হ্যায়?

উত্তর পাওয়া গেল না; কিন্তু মিনিট দুই পরেই দেখা গেল, একটি ক্রন্দনরত ভদ্রলোকের সঙ্গে একজন জমাদার, একজন দারোগা আর দুটি কনষ্টেবল ওদিক দিয়ে ঘুরে এসে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো। দারোগাটি নমস্কার জানিয়ে বললে—ক্ষমা করবেন, এখানে একটি লোককে খুঁজতে এসেছিলাম। যজ্ঞেশ্বর ঘটক এখানে কা'র নাম?

সকলেই বজ্রাহতের মত তাকিয়ে রইলো। রোরুদ্যমান ভদ্রলোকটি চোখ মুছে বললেন—এখানে সে নেই দারোগাবাবু।

সিদ্ধেশ্বর ইতিমধ্যে কখন্ যে অদৃশ্য হয়ে গেছে কেউ জানে না।

অমরেশ বললেন—সিদ্ধেশ্বর পাঠক বলে একটি লোক—

হ্যাঁ, ওই লোকটাই। মাঝে মাঝে এই নামে চলে। কোথায় সে মশাই? কোথায় বলুন ত?